ছাত্র সংবাদ
ডিসেম্বর ২০২৪
পৌষ ১৪৩১
জমাদিউস সানি ১৪৪৬

যো গা যো গ
ছাত্র সংবাদ
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৫৩৮
E-mail : chhatra_sangbad@yahoo.com
www.chhatrasangbadbd.com

প্র কা শ না য়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ৩০ টাকা

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য়

আমাদের বিজয়ের লাল সূর্যটা উদিত হতে গিয়েও পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ দুই শতাব্দী। ৪৭'-এ দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা উঁকি দিয়েছিল আরো একবার। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট-এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। জন্ম হয় নতুন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট হিসেবে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে যুক্ত হয় স্বাধীন পাকিস্তানের সাথে। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হয় স্বাধীন ভারতের সাথে।

বাংলার মানুষ স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে দীর্ঘদিনের শৃঙ্খলময় জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে এবার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। কিন্তু সেটাও আর স্থায়ী হলো না। এবার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোষণ করতে লাগল সহজ সরলমনা বাঙালীদের। কিন্তু বাঙালী সবসময় স্বাধীনচেতা জাতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে তাকে রুখে দেওয়া যায় না। তাইতো ৫২'-তে যখন ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন এদেশের ছাত্র-জনতা বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল। জীবনের বিনিময়ে এনেছিল বাংলা ভাষার স্থায়ী মর্যাদা।

এরপর আসে স্বৈরাচার আইয়ুব। জুলুম-শোষণের এক কালো অধ্যায় রচনা করে দীর্ঘ প্রায় একযুগ। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ক্ষমতা দখলের পর থেকে স্বৈরাচারী মনোভাব যেন তার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল। অবশেষে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় আইয়ুব খান। আইয়ুবের পর আসে ইয়াহিয়া। শাসক পরিবর্তন হয় কিন্তু শোষণ আগের মতোই রয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের রক্তিম সূর্যটা উদিত হয় এদেশের পূবাকাশে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা শব্দটি অবশেষে আমাদের হলো। আমরা অর্জন করলাম এক মহান বিজয়।

কিন্তু স্বাধীনতা শব্দটি হঠাৎ করে আবারো ছিনতাই হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে গুম-খুন-লুটতরাজের মাধ্যমে সদ্য জন্ম নেওয়া দেশটাকে পরিণত করা হয় এক মগের মুল্লুকে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীবলে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমগ্র রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামক এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। শুরু হয় স্বাধীন দেশের প্রথম স্বৈরশাসন। কিন্তু ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক সেনা অফিসাররা পুনরায় উদ্ধার করে এদেশকে। কিন্তু স্বৈরাচারও ফিরে আসে বারবার।

এরপর ১৯৮৩ সালে আসে স্বৈারাচার হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ছাত্র-জনতার ৯০'-এর গণঅভ্যুত্থানে তারও পতন হয়। তারপর ১৯৯৬-এ বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনে তাদের সেই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পঁচাত্তরের বাকশাল ৯৬'-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রূপে আবার ফিরে আসে ক্ষমতায়। যদিও তখন ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত রূপ দেখায়নি তারা। তবে ফখরুদ্দীন-মঈনুদ্দীন এর কাঁধে ভর করে ২০০৯-এ ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ তার ফ্যাসিবাদের বিষদাঁত উন্মোচন করে এবং বিগত ১৬ বছর ধরে জাতির ওপর সিন্দাবাদের ভূত হয়ে চেপে বসেছিল। ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করে তারা। কিন্তু এবারও পার পায়নি ফ্যাসিবাদী এই গোষ্ঠী। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয় তারা। এই দেশের বুকে আবারো ফিরে আসে নতুন বিজয়।

এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এই বিজয়ের শুকরিয়া আদায় করা। বিজয়কে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এই নতুন বিজয়কে যাতে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি ছিনতাই করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

সর্বোপরি নতুন বাংলাদেশকে নতুন করে সাজাতে ছাত্র-জনতার ইস্পাতদৃঢ় যে শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে। আগামী দিনে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি ষড়যন্ত্র করে বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে চাইলে ছাত্র-জনতাকে আবারো ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী দিনের যে-কোনো ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য ছাত্রসমাজকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

নতুন বাংলাদেশকে নতুন করে সাজাতে ছাত্র-জনতার ইস্পাতদৃঢ় যে শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে। আগামী দিনে নতুন কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি ষড়যন্ত্র করে বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে চাইলে ছাত্র-জনতাকে আবারো ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে ”

আখিরাতে সফল নারী-পুরুষের গুণাবলি

ড. মুহাঃ রফিকুল ইসলাম

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّ
الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

সরল অনুবাদঃ

(৩৩) নিজেদের গৃহ মধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলি যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবী পরিবার থেকে ত্রুটি দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে।

(৩৪) আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয় তা মনে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

(৩৫) একথা সুনিশ্চিত যে, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকাদানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী। আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব)

নামকরণ

এ সূরাটির ২০ নং আয়াত يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا এর 'আহযাব' শব্দ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে।

সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল ও সূরার মূল আলোচ্য বিষয়

এ সূরাটি ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে নাযিল হয়। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

এক. আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।
দুই. বনি কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরির যিলকাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়।
তিন. হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী (সা)-এর বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিলকাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

প্রাগুক্ত আয়াতের আলোচ্য বিষয়

৩৩ এবং ৩৪ নম্বর আয়াতে নবীর স্ত্রীদের জন্য উপদেশ ও বিশেষ বিধান প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৫ নম্বর আয়াতে মুমিনদের বিশেষ গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসির

৩৩ নং আয়াত : وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, 'নারীর আসল অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। কেবল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে' (ইবনে কাসির, মুয়াসসার)। আয়াতের শব্দাবলি থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী (সা)-এর হাদিস একে আরো বেশি সুস্পষ্ট করে দেয়। মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালি ও সন্তানদের আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোনো অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চয়তা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, "নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।" (সহিহ ইবনে খুযাইমাহ ১৬৮৫, সহিহ ইবনে হিব্বান ৫৫৯৯)

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

আরবী ভাষায় 'তাবাররুজ' মানে হচ্ছে উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। দূর থেকে দেখা যায় এমন প্রত্যেক উঁচু ভবনকে আরবরা 'বুরুজ' বলে থাকে। দুর্গ বা প্রসাদের বাইরের অংশের উচ্চস্থান থেকে দেখা যায় বলে তাকে 'বারজা' বলা হয়, নারীর জন্য তাবাররুজ শব্দ ব্যবহার করা হলে তার তিনটি অর্থ হবে।

এক. সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়।
দুই. সে তার পোশাক ও অলঙ্কারের বহর লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে।
তিন. সে তার চাল-চলন ও চমক-ঠমকের মাধ্যমে নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে।

অভিধান ও তাফসির বিশারদগণ এ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ (রহ) বলেন, 'তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে, গর্ব ও মনোরম অঙ্গভঙ্গি সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা।' মুকাতিল বলেন, 'নিজের হার, ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।' আল মুবাররাদের উক্তি হচ্ছে: 'নারীর এমন গুণাবলি প্রকাশ করা যেগুলো তার গোপন রাখা উচিত।' আর উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছে 'নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ নারীদেরকে যে কার্যধারা থেকে বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে গৃহ থেকে বের হওয়া। তিনি তাদের আদেশ দেন, নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। কারণ, তোমাদের আসল কাজ রয়েছে গৃহে, বাইরে নয়। কিন্তু যদি বাইরে বের হবার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে বের হয়ো না যেমন জাহেলি যুগে নারীরা বের হতো। প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা করে, সুশোভন অলঙ্কার ও আঁটসাঁট বা হালকা মিহিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে চেহারা ও দেহের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে এবং গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের নারীদের কাজ নয়। এগুলো জাহেলিয়াতের রীতিনীতি। ইসলামে এসব চলতে পারে না।

সুতরাং বর্তমানে যে নারীরা নিজকে প্রদর্শন করে, শরীর উন্মুক্ত রেখে চলাফেরা করেন তারা প্রকারান্তরে জাহিলি জীবনের অনুসরণ করেন। তবে তাদেরকে সামাজিক কালচার বা সোশ্যাল সিকিউরিটির ইস্যু বিবেচনায় এমন চলাফেরা থেকে নিবৃত্ত করা যায়।

৩৪ নং আয়াত : وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

মূলে اذْكُرْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুটি অর্থ : মনে রেখো এবং বর্ণনা করো। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়:

হে নবীর স্ত্রীগণ। তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেওয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। লোকেরা এ গৃহে জাহিলিয়াতের আদর্শ দেখতে থাকে, এমন যেন না হয়।

দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয় : হে নবীর স্ত্রীগণ ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রাসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না।

এ আয়াতে দুটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে।

এক. আল্লাহর আয়াত
দুই. হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত। কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো নবী (সা) লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী (সা) নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

অর্থাৎ মানুষ কোথা থেকে বের হয় সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ সূক্ষ্মভাবে জানেন এবং সে কোথায় থাকে, তার অবস্থানস্থল কোথায় এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ সূক্ষ্মভাবে অবগত। (ইবনে কাসির) আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ গোপনে এবং অতিসংগোপনে রাখা কথাও তিনি জানতে পারেন। কোনো জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ যেতে পারে না। (তাফহীম)

৩৫ নং আয়াত : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

এখানে মুমিনদের বিশেষ গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একদা উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার যত্ন করছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলো ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন।

আগের দুই আয়াতে যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন কাজ সাধারণভাবে এসব নির্দেশ অনুযায়ীই করতে হবে। অথবা কোন কোন কাজ করলে মুমিন নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী হবে, আখিরাতে সফলতা লাভ করবে তার কথা বলা হয়েছে।

এতে মহিলাদের মন জয় করা হয়েছে। তাছাড়া সকল আহকামে পুরুষদের সাথে মহিলারাও শামিল, শুধু তাদের কিছু বিশেষ আহকাম ছাড়া যা তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা পরিস্ফুটিত হয় যে, ইবাদাত ও আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের মান-মর্যাদায় পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্য একইভাবে সে ময়দান খোলা আছে এবং উভয়েই বেশি বেশি নেকি ও সওয়াব অর্জন করতে পারে। কেবল জাতিভেদে তাদের মাঝে কোনো কম-বেশি করা হবে না। এছাড়া মুসলমান ও মুমিনের পৃথক পৃথক বর্ণনা করায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। ঈমানের স্থান ইসলামের ঊর্ধ্বে; যেমন কুরআন ও হাদিসের অন্যান্য দলিল দ্বারা তাই প্রমাণ হয়। (তাফসিরে আহসানুল বায়ান)।

এখানে যত গুণাবলির কথা বলা হয়েছে যেমন: মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠা নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ ও রোযাপালনকারীনি নারী, যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারীনি নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীনি নারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। এ সকল গুণের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। এত বিশদ বর্ণনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এ জন্য وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী

> আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায় ।... আহার করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে । আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে । আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে । কথাবার্তায় তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে

পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীনি নারীদের কী করণীয় হতে পারে তা আলোকপাত করা হলো ।

আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায় । মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না । মানুষের চেতনার জগৎ অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে । আহার করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে । আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে । আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে । কথাবার্তায় তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে ।

প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে । প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে । প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তার রহমতের প্রত্যাশী হবে । প্রত্যেক সঙ্কটে তার দিকে মুখ ফিরাবে । কোনো খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে । কোনো ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে । প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে । মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ । অন্য যে কোনো ইবাদাতের জন্য কোনো না কোনো সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায় । কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারি থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগির সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে । মানুষের মন কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরই মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দ্বীনি কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় । মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাত ও দ্বীনি কাজ ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে ওঠে । পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দ্বীনি কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালীর বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে । এ কথাটিই নবী (সা) একটি হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ।

"মুআয ইবনে আনাস জুহানি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? তিনি জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে । তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে কে । জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করবে । আবার তিনি একইভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন । জবাবে নবী করিম (সা) বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে ।" (মুসনাদে আহমাদ)

আয়াতসমূহের শিক্ষা

১. নারীদের জন্য সবসময় ঘরে অবস্থান করা উত্তম ।
২. অতি প্রয়োজন না হলে নারীদের ঘরের বাইরে বের না হওয়া ।
৩. নিজ ঘরকে কুরআন এবং হাদিস চর্চার মারকাজ বানানোর চেষ্টা করা ।
৪. নারীরা বাইরে বের হলেও কোনোভাবেই পুরুষের নজরে পড়ে এমন সাজসজ্জা না করা ।
৫. অল্পে তুষ্ট, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল এবং মহান আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার মাধ্যমে আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা ।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন এবং আখিরাতে সফলতা অর্জনের মতো গুণাবলি দান করুন ।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর থেকে জুলাই বিপ্লব : বিজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়

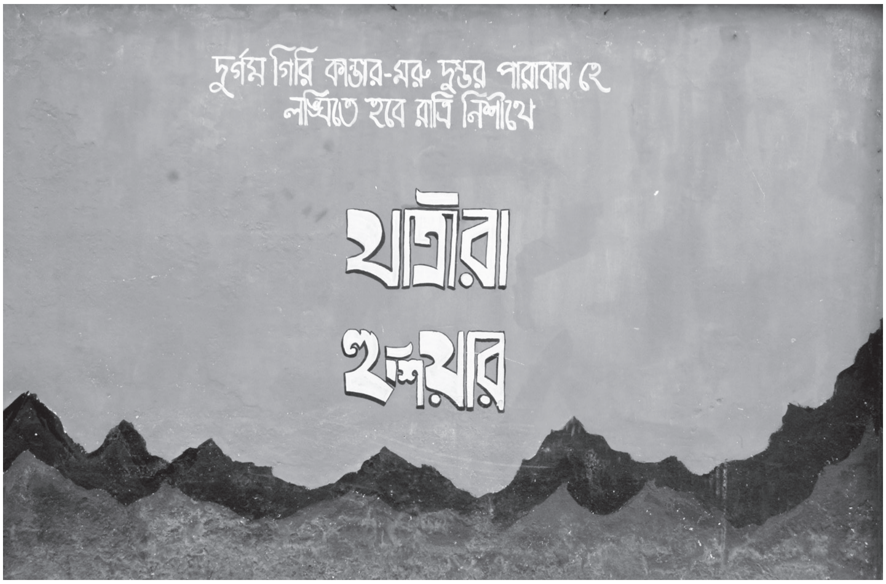
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ



জন্মগতভাবেই মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয়। বাঁচতে চায় বিজয়ের বেশে। স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্যই মানুষ সংগ্রাম করে; প্রতিনিয়ত জীবনের প্রতিটি পর্বে স্বাধীন কর্মক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে নমরুদ, ফেরাউন কিংবা এরকম জালিম শাসকেরা প্রকান্তরে ফ্যাসিবাদী নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। জনগণ থেকেছে আজ্ঞাবহ দাসের মতোন। সেই ধারাবহিকতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে ইন্দোনেশীয় ডাচরা ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় শাসন করেছে। সর্বভারতীয় অঞ্চলে ইংরেজ ও ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাসিবাদ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দ্বিচোখা নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে আধুনিক ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল। সবশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মুজিবীয় আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাকশালীয় ফ্যাসিবাদ এবং শেখ হাসিনার শাসনামলে অগ্রসরমান ও ডিজিটালাইজড ফ্যাসিবাদের কবলে পড়তে হয় দেশবাসীকে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই বিপ্লবের উত্থান মূলত এই ফ্যাসিবাদের অন্ধকার প্রতিরোধকল্পেই সংগঠিত হয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের রক্তাক্ত পথচলা

ইংরেজ ও ব্রিটিশ গোলামী থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির কারণে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ছাত্র, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে বৈষম্যহীন ও ইনসাফভিত্তিক চেতনার বাংলাদেশ পাওয়ার একটি প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয়। স্বাধীনতার পরপরই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগ বাকশালের মাধ্যমে হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদের প্রতীক। আর স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার দোহাই দিয়ে অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে বাংলাদেশ হতে থাকে বঞ্চিত। ফলে সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বাকশালীয় ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে।



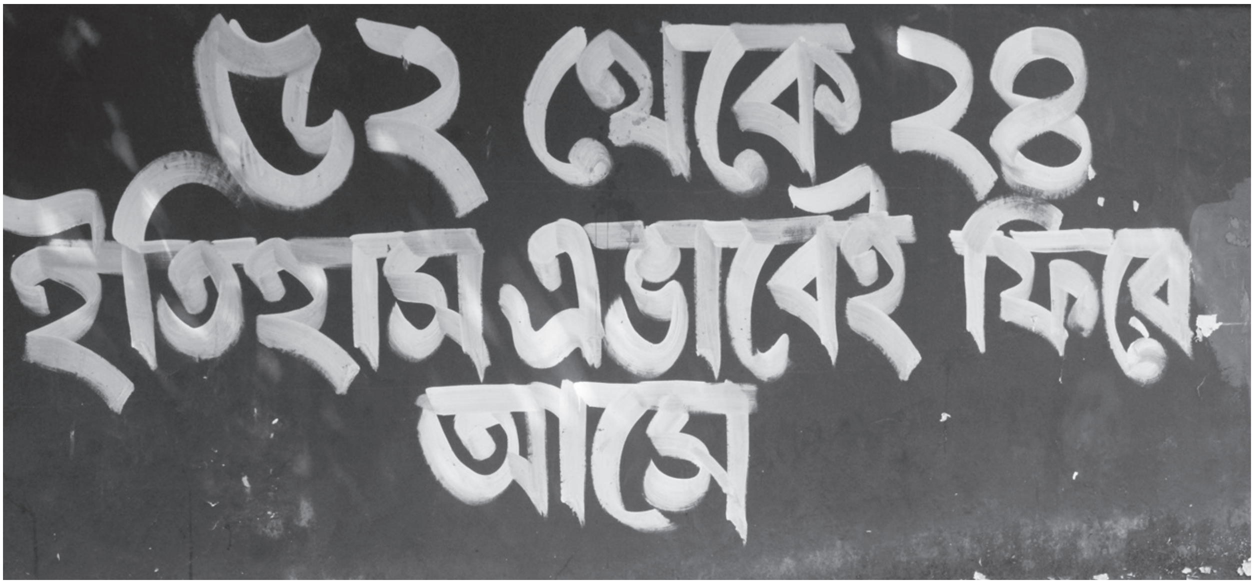
শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে ফ্যাসিবাদের দোসর ও সুবিধাভোগীরা। এমতাবস্থায় সরকারের মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী ও সুবিধাভোগী পুলিশ প্রশাসন ছাত্র-জনতার ক্ষোভ থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দেয়

ফ্যাসিবাদের পরবর্তী প্রজন্মের পুনরুত্থানে বাংলাদেশ যেন আবারও পথ হারায়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে তার কিছু আঁচ পাওয়া গেলেও পূর্ণতা পায় ২০০৮ সালের সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচন, ২০১৮ সালের রাতের ভোটের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস চালায় আওয়ামীলীগ। সেই সময় থেকে বিগত সাড়ে পনেরো বছর জগদ্দল পাথরের মতো এদেশের জনগণের ওপর চেপে বসেছিল ভারতীয় আধিপত্যবাদের এদেশীয় দোসর ফ্যাসিবাদী চরিত্র নিয়ে। বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, আইন অঙ্গনসহ সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। ক্ষমতাকে টেকসই করতে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে কেবলমাত্র দলীয় লোক নিয়োগের হাতিয়ারে পরিণত হয় কোটাব্যবস্থাকে। মেধাবীদেরকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে বাদ দিয়ে মেধাহীন আওয়ামী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এই কোটার বিরুদ্ধে অবস্থান থেকেই আন্দোলন পরবর্তীতে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

১৯৯৭ সালে কোটা সংস্কারের প্রথম দাবি উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার এতে কর্ণপাত না করে উল্টো নেতাকর্মীদেরকে নির্যাতন করে। পরবর্তীতে ২০০৭ ও ২০১২ সালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আবারো কোটা সংস্কারের দাবি তোলে। এ সময়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতাকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হন। কোটা সংস্কার আন্দোলন বড় আকারে রূপ নেয় ২০১৮ সালে। 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদ'-এর ব্যানারে এই আন্দোলন সর্বব্যাপী রূপ লাভ করে। আন্দোলনের মুখে ১১ এপ্রিল সংসদে দাঁড়িয়ে সব ধরনের কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে তা পরিপত্রের মাধ্যমে কার্যকর হয়। ২০২১ সালে এই পরিপত্রের বিরুদ্ধে একটি রিট করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ জুন সেই রিটের রায়ে পরিপত্রটি অবৈধ ঘোষণা করে কোটা পুনর্বহালের আদেশ আসে। এ ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং কোটা বাতিলের দাবি জানায়। পাশাপাশি দাবি বাস্তবায়নের জন্য ৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্রদেও পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে চার দফা দাবিতে ১ জুলাই থেকে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে যেন এক নতুন প্রজন্মের দেখা মেলে। বারবার মূলা ঝুলিয়ে ছাত্রদের দাবি অবাস্তবায়িত রাখার ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার অপকৌশল শিক্ষার্থীদের এবার আর ফাঁকি দিতে পারেনি। অবশেষে গণঅভ্যুত্থান সফল হয় ৫ আগস্ট ২০২৪ দুপুরে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ায় মধ্য দিয়ে। বিদায় নেয় জোরপূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরা রাখা ঘষেটী বেগমের উত্তরসূরী মুসোলিনীর প্রেতাত্মা আওয়ামী লীগ।আগস্ট মাসে গণঅভ্যুত্থান সফল হলেও আন্দোলনকারী চৌকস শিক্ষার্থীরা ঐ তারিখকে '৩৬ জুলাই' ঘোষনা দিয়ে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বিপ্লবের নামকরণ করে 'জুলাই বিপ্লব'।

শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে ফ্যাসিবাদের দোসর ও সুবিধাভোগীরা। এমতাবস্থায় সরকারের মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী ও সুবিধাভোগী পুলিশ প্রশাসন ছাত্র-জনতার ক্ষোভ থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দেয়। গণঅভ্যুত্থানে একটি দেশে একযোগে সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী এবং ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন: সাংবাদিক, পুলিশ, সেনা কর্মকর্তা, আমলা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্বে বিরল। নির্মম গণহত্যা পরিচালনার নির্দেশদাতা শেখ হাসিনার ওপর জনরোষ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, ৫ ও ৬ আগস্ট সারাদেশে শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও তার পরিবার সম্পর্কিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি সমূলে উৎপাটন ও নাম পরিবর্তন করে ছাত্র-জনতা। সূচিত হয় নতুন এক অধ্যায়ের।

অভূতপূর্ব এক অভ্যুত্থানের আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ। মাত্র এক মাসে ছাত্র-জনতার উদ্বেলিত উৎসাহে রক্ত-কালি দিয়ে



ঢাকা এবং সারা দেশের রাজপথে যে ইতিহাস লেখা হলো, তা বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল। অপ্রতিরোধ্য, 'আনচ্যালেঞ্জড', আমৃত্যু ক্ষমতা ধরে রাখার প্রায়-প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা সব কেমন অসহায় আত্মসমর্পণ করে ফেলল গণজাগরণের সম্মিলিত শক্তির কাছে! এই গণজাগরণ এবং তার অনিবার্য ফলাফল বাংলাদেশের ইতিহাসই শুধু পাল্টায়নি; পাল্টে দিয়েছে আমাদের কথা বলার ধরন, চিন্তাশক্তি, সত্য প্রকাশের প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি এবং সর্বোপরি জীবনযাপনের পদ্ধতি। এটি দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, ২০২৪-এর ৫ আগস্টে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এমনকি ৪ঠা আগস্টের বাংলাদেশ থেকেও ভিন্ন। ছাত্র-জনতার অনুরোধে ৭ আগস্ট দেশে আসেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। ৮ আগস্ট দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন অংশীজনের উপস্থিতিতে বঙ্গভবনে উপদেষ্টা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৯ আগস্ট দপ্তর বণ্টন করা হয়। এভাবে এক নতুন বাংলাদেশকে দেখল বিশ্ববাসী।

ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলন ও জুলাই বিপ্লব

দেশের এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতেসারাদেশের ট্রাফিক ও পুলিশ সদস্যরা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকে। যানজট নিরসনে ১১ আগস্ট পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে ছাত্রসমাজ। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়, বাড়িঘর ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পাহারার দায়িত্ব নেয় জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্ররা। এছাড়া বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা তৈরি হলে সেগুলোও নস্যাৎ করে দেয় ছাত্র-জনতা।দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংকটের মাঝে ভারত সীমান্তের ডুম্বুর বাঁধ খুলে দেওয়া এবং একাধারে বৃষ্টি হওয়ায় স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যায় চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ এলাকা ডুবে যায়। এই সংকট মোকাবিলায় সকল ধর্ম-বর্ণ-দল, শ্রেণি-পেশার মানুষ একসাথ হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর যে নজির স্থাপন করে, তাতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক প্রত্যয় সকলের চোখে মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবকে গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব প্রত্যয়গুলো একই রকম মনে হলেও এদের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন বিদ্রোহ বলতে বোঝায় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ; এবং অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এর ফলে সরকার পরিবর্তন হয় না, নামমাত্র প্রশাসনিক সংস্কার হয়। এদিকে অভ্যুত্থানের ধারণা বিদ্রোহ থেকে ব্যাপকতর। জনগণ যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে আসে এবং সেখানে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেয়, তখনই একে গণ-অভ্যুত্থান বলে। যেখানে সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং পরিবর্তনের জন্য রাজপথে নেমে পড়ে। গণ-অভ্যুত্থান হঠাৎ করে ঘটে। তাই সরকারের নীতি বা শাসন এখানে গুরুত্ব পায় না; ক্ষমতা লাভই এখানে সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে বিপ্লব কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনো স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে অথবা ঘুণে ধরা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের সমগ্র অংশের বিক্ষোভের নাম বিপ্লব। এটা কোনো একটা দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এক দেশ থেকে উত্থান হয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহুদিন পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বজায় থাকে।

শিক্ষার্থীদের বিদ্রোহ গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে। কারণ প্রথমত, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের অভিভাবক ও শ্রমিক শ্রেণীসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষ। দ্বিতীয়ত, ঢাকা কেন্দ্রিক না থেকে এ আন্দোলন সারা দেশের জেলা-উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, এ আন্দোলনের মাধ্যমে কোটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে সরকার পরিবর্তনের এক দফায় পরিণত হয়েছে। তবে এ গণ-

অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট একটা পক্ষ কিংবা রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না।

সত্যিকার অর্থে, এখনো বিপ্লব হয়নি। বিপ্লব বলা যাবে তখন, যখন কাঠামোগত পরিবর্তন আসবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলে একে বিপ্লব বলা যেতে পারে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের যাত্রা নিয়ে শঙ্কা রয়েই গেছে। টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্কার না করতে পারলে আবারো নতুন করে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে পারে। কেননা ১৯৭২ সাল থেকে যে শ্রেণীগত শাসন চলে আসছে, সেখানে প্রত্যেকটি শাসন ব্যবস্থা ছিল ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক। ১৯৭৫ সালের আগে শেখ মুজিবের আওয়ামী-বাকশালী ব্যবস্থা কায়েম ছিল। বাংলাদেশের জনগণ একের পর এক ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসন দেখেছে।

ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার জন্য অসংখ্য উপাদান আমাদের সংবিধান, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে কোনো ভারসাম্য নেই। প্রধানমন্ত্রীই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, রাষ্ট্রপতি পদ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে দলীয় প্রধান, সরকারপ্রধান এবং জাতীয় সংসদ নেতা।

ছাত্রবিদ্রোহ থেকে সৃষ্ট এ গণ-অভ্যুত্থানের পূর্ণ সুফল পেতে এবং সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদকে রুখতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংস্কার অতীব জরুরি। করপোরেট গ্রুপ, ধনিক শ্রেণী, বহুজাতিক গোষ্ঠী, স্বৈরাচারের দোসরদের হাত থেকে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের হাতে আনতে হলে পুরো গণতান্ত্রিক রূপান্তর দরকার। মনে হতে পারে অনেক কাজ; কিন্তু না। রাষ্ট্রের সব উদ্যোগের কেন্দ্রে জনগণকে রাখলেই সংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এতদিন কেন্দ্রে ছিল বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। এ তিন গোষ্ঠীর কারণে রাষ্ট্রে অগণতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক ও জবাবদিহিহীন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এদের দাপট কমাতে পারলে গণতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব। এক্ষেত্রে সংবিধান, আইন-কানুন, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নীতিমালা, পরিকল্পনাসহ সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের দলীয়করণের মাত্রা পূর্বের যে-কোনো সময়কে ছাড়িয়ে যায়। বেসামরিক প্রশাসন, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হাতে, ওপরন্তু কর্মকর্তারাই আওয়ামীলীগের কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা প্রকট আকার ধারণ করে। কিন্তু সাহসী ছাত্র-জনতার ঐকান্তিক প্রয়াসে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়ে যায়।

২০২৪-এর এই গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সমগ্র জাতিকে এক মোহনায় মিলিত করে। বিশেষ করে ১৯৭১-কে পুঁজি করে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ বিতর্কের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিভক্তির রেখা মুছে যায় '২৪ এর বিপ্লবী চেতনার মাধ্যমে। কিছু রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রোপাগান্ডা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের গণমাধ্যমগুলো একপ্রকার গুজব সেল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু দেশের সকল রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পক্ষ একসাথে হিন্দুদের উপাসনালয়, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পাহারা ও সংরক্ষণের কর্মসূচি দেশের মানুষের মধ্যকার বিভেদকে ঘুচিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪ আগস্ট শাহবাগে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় সকল জাতীয় ছাত্রসংগঠন, বিভিন্ন ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষ সাম্য ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করেন। মূলত এর মধ্য দিয়ে দেশে সম্প্রীতি গড়ে ওঠার একটি পরিবেশ ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছি আমরা। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদের চরম শিখরে উঠে পড়ে। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। বঞ্চিত করতে থাকে আপামর জনগণকে। ফলে ফুঁসে ওঠে দেশের সাধারণ মানুষ।

দেশের সংস্কারের জন্য গণঅভ্যুত্থানকে জুলাই বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রজনতার আকাঙ্ক্ষার আলোকে বৈষম্যমুক্ত ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়া এখন সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনতার প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবিধান পুনর্লিখন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে নতুন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে দেশবাসী। এই নতুন সভ্যতা বির্নিমাণে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রমিক নাগরিক তৈরির বিকল্প নেই। ছাত্রজনতার অজস্র ত্যাগের এই গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবে পরিণত করতে রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে প্রয়োজনের আলোকে সংস্কার জরুরি। অন্তবর্তী সরকারকে কিছু মৌলিক বিষয়ে সবার আগে গুরুত্বারোপ করা দরকার, তা হলো- ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার সুষ্টু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, আধুনিক ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় ও আর্দশিক সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ, কর্মক্ষম যুবকদের কর্মসংস্থান ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ। সেইসাথে শ্রমিক মালিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া আন্দোলনে আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা ও পুর্নবাসন, শহীদ পরিবারে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, ছাত্ররাজনীতির সময়োপযোগী সংস্কার করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধতা এখন সময়ের দাবি। দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণ করতে সকলকে একসাথ হয়ে প্রতিটি সেক্টর পূনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার পাশাপাশি সকল নাগরিক এবং শিক্ষার্থী নিজ নিজ জায়গা থেকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে একতা ও সম্প্রীতির এক নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে এখন গণঅভ্যুত্থানকে জুলাই বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। তাহলেই ডিসেম্বরের মহান বিজয় স্বার্থকতা পাবে।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৫ আগস্ট ২০২৪-এর চেতনা ও ইসলামী আন্দোলন



অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। দেশের জনগণ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে অত্যাচারী শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ অপশাসনামলে। আর দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই ফ্যাসিবাদী সরকার গুম খুন হত্যা, নির্যাতন এবং মানুষের অধিকার হরণ করে দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। বাতি নিভিয়ে রাতের আঁধারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। দেশের সেনাবাহিনীর জেনারেল, উচ্চশিক্ষিত অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টারসহ হাজার হাজার মেধাবী নাগরিকদেরকে তারা গুম করে আয়নাঘরে বন্দী রেখেছিল। ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে জুডিশিয়াল কিলিং করেছে। মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারিয়েছিল। বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশের সংস্কৃতিকেও তারা ধ্বংস করেছে। ছাত্ররা যখন তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করে কোটা বাতিলের দাবিতে তখন তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েছে, খুন করে পুলিশের গাড়ির ওপর থেকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছে। এদেশের মানুষ তাদের কাছে কখনোই নিরাপদ ছিল না। স্বজন হারানো মানুষের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। হাসপাতালগুলোতে আহত আর নিহতদের রোনাজারিতে বিবেকবান প্রতিটি মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও মানুষ স্বস্তিতে কথা বলার সুযোগ পায়নি, প্রতিবাদ করলেই দমন পীড়ন চলত। মানুষের অধিকার হরণ করার ইতিহাসে স্বৈরাচারী হাসিনার সরকার ছিল কুখ্যাত। তাই ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের বিপ্লব ছিল অনিবার্য।

বিশ্ব গণমাধ্যমে ৫ আগস্ট

৫ আগস্টের খবর আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। বিবিসির খবরের শিরোনাম করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা প্রাসাদ (গণভবন) দখলে নিয়েছে।' আল জাজিরা বলেছে, 'একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। তার সরকারি আবাস গণভবনে হাজারো মানুষ ঢুকে পড়েছে।' কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি সেনাপ্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হবে।' এএফপির খবরেও বোনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, 'নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে তিনি দেশ

ছেড়েছেন।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এএফপি বলেছে, 'হাজারো মানুষ গণভবনে ঢুকে পড়েছে।'

রয়টার্স বলছে, 'শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়েছেন। বাংলাদেশও ছেড়ে গেছেন।' দ্য গার্ডিয়ান সেনাপ্রধানের সূত্র দিয়ে সংবাদে বলেছে, 'শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে, সেনাপ্রধান নিশ্চিত করেছে।' সিএনএনের খবরে বলা হয়, 'এক সপ্তাহের বেশি প্রাণহানি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পদত্যাগ করলেন শেখ হাসিনা।' ওয়াশিংটন পোস্টও সেনাপ্রধানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে জানিয়েছে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন এবং দেশ ছেড়েছেন।'

টাইমস অব ইন্ডিয়াও একই সংবাদ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও একই সংবাদ প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন। প্রতিবেদনে তারা বলেছে, 'শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ চালাবে।' পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র আনন্দবাজারের খবরে বলা হয়, ''প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে তিনি ঢাকার বাসভবন তথা 'গণভবন' ছেড়েছেন। তাকে হেলিকপ্টারে করে 'নিরাপদ' আশ্রয়ের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।''

ঐক্য স্থাপনই জনগণের সফলতা এনেছিল

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে ধরে রাখতে গোটা জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খুনি লুটেরা দুর্বৃত্ত নতুন করে যেন ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। জুলাই আন্দোলনের শহীদ এবং আহতদের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতার সুফল জনগণ পায়নি। যারা স্বাধীনতার দাবিদার ছিল তারা স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছতে দেয়নি। তারা নিজেদের এবং দলের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। তারা জনগণের স্বার্থ পূরণ করেনি। তখনকার স্বাধীনতার কথা ছিল বৈষম্য দূর করা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও অধিকার আদায় করা। দেখা গেল জনগণের অধিকার তো আদায় করেইনি বরং তারা যাদের সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের গোলামি করা শুরু করল। দেশে পাটের গুদামে আগুন লাগাল। আগুন আর আগুন সারা দেশে শিল্প কলকারখানা ধ্বংস করে দেয়া হলো। পাটের বাজার ধ্বংস করে প্রতিবেশী দেশের বাজার সৃষ্টি করে দেয়া হলো। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সকল দল নিষিদ্ধ করা হলো। বাকশাল কায়েম করা হলো। সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করে সরকারের গোলামি করার জন্য চারটি পত্রিকা রাখা হলো। দেশে অভাব অনটন শুরু হলো। জনগণ না খেয়ে দিন কাটাতে লাগল।

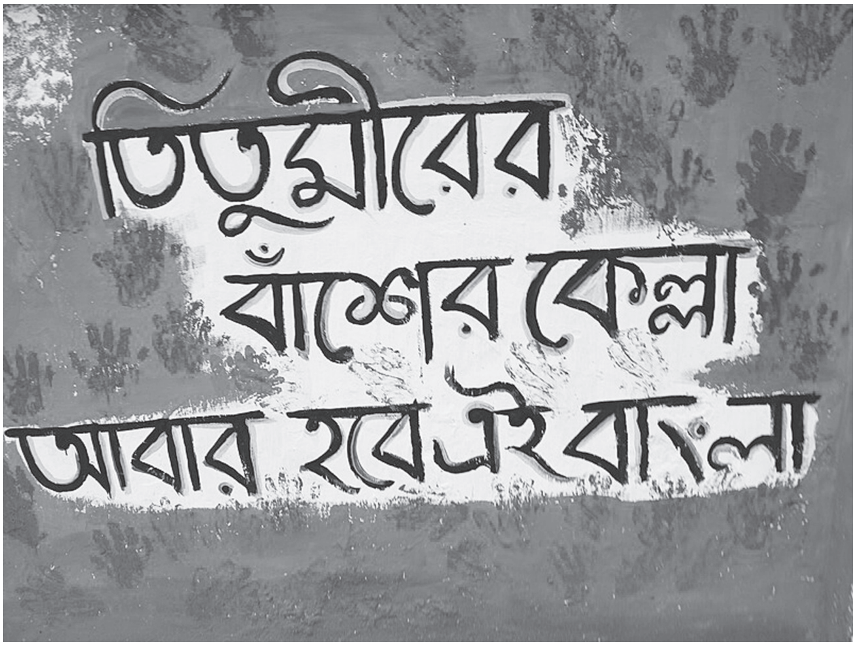
পত্রিকার রিপোর্ট প্রকাশ 'ক্ষুধার কারণে মানুষের বমি খেয়ে জান বাঁচার চেষ্টা করল।' ভাগাড়গুলোতে কুকুর এবং মানুষের উচ্ছিষ্ট নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। অভাব অনটনের এ চরম দৃশ্য আর ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। পরিস্থিতি এমন হলো নিজের দলের লোকেরা অন্যদের হত্যা করে নিজেরাই ক্ষমতা দখল করল। গণতন্ত্রের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। আন্দোলন শুরু হলো, কেয়ারটেকার সরকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষ জীবন দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ সরকার হিসেবে কেয়ারটেকার সংবিধানে যোগ হলো। পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাওয়ার পরে চিরদিন ক্ষমতায় থাকার অভিলাষে নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকার এর বিধান বাতিল করা হলো। ১৭ বছর জুলুম অত্যাচার নির্যাতন জেল জুলুম ফাঁসি খুন গুম হত্যা চলতে থাকল। বিরোধী দলকে আর আন্দোলন করতে দেওয়া হলো না। ১৪৪ ধারা জারি, দেখামাত্র গুলি, গোপন ষড়যন্ত্র ও জঙ্গি অভিযোগ দিয়ে অসংখ্য নেতাকর্মীকে জেল দেওয়া হলো। নারী-পুরুষ যুবক শিশু পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ জেল খাটতে লাগল। দলীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ দখল করা হলো। পুলিশ বিডিআর বিজিবি আনসারসহ বিচারক এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শুধুমাত্র দলীয় লোককেই নিয়োগ দেওয়া হলো। নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জুলুমের রাজত্ব চালাতে লাগল। ছাত্র-জনতা জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ প্রতিবাদ শুরু করল। লক্ষ লক্ষ মানুষ জেল খাটল আসামি হলো। গায়েবি মামলা দিয়ে মানুষকে অসহায় করে ফেলা হলো। সবশেষে ছাত্ররা তাদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করল। ক্রমে ক্রমে সে আন্দোলন ছাত্র-জনতা পেরিয়ে সাধারণ জনগণের বিক্ষোভে পরিণত হলো। দেড় হাজারেরও বেশি শহীদ ও অর্ধ লক্ষ আহত ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে ও অগণিত নারী-পুরুষ-শিশু জেল জুলুমের শিকার হয়ে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ৫ আগস্ট দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করল। মানুষ কথা বলার স্বাধীনতা ফিরে পেল, রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা পেল, আলহামদুলিল্লাহ।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দেশ পথ হারিয়েছিল আর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশ আবার পথের দিশা ফিরে পেয়েছে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের শহীদদের পরিবার ও আহতদের বক্তব্য শুনলে পাষাণ হৃদয় নরম হয় ও অজান্তে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। ফ্যাসিস্টরা বিদায় হয়েছে এখন তাদের বিচার নিশ্চিত করার পালা। শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা দিয়ে সাপের মতো করে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে লাশের ওপর নাচানাচি করা হয়েছিল। ২৮ অক্টোবরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিল আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম মহড়া। দ্বিতীয়ত তারা ১/১১ এর ফখরুদ্দীন-মঈনউদ্দিন সরকারের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় গিয়ে পিলখানা হত্যাকাণ্ড দিয়ে গণহত্যা শুরু করে। বিচারিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ধারাবাহিকভাবে আল্লামা সাঈদী রাহিমাহুল্লার রায় পরবর্তী গণহত্যা, শাপলা চত্বরের গণহত্যা এবং সর্বশেষ ২৪ এর জুলাই-আগস্টের গণহত্যা চালায়। হাজারো ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে ৫ আগস্ট দীর্ঘ ১৭ বছর পর ফ্যাসিস্টসরকার ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এ গণ-অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। আল্লাহর সাহায্যে এ কৃতিত্ব ছাত্র-জনতার। শেখ হাসিনা অহংকার করে বলেছিলেন, তিনি কখনো পালিয়ে যান না! কিন্তু জান বাঁচানোর জন্য তিনি চোরের মতো পালিয়ে যান।

সুরক্ষিত এবং কঠিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, 'গণভবন'। এই গর্ত থেকে



এ গণ-অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। আল্লাহর সাহায্যে এ কৃতিত্ব ছাত্র-জনতার। শেখ হাসিনা অহংকার করে বলেছিলেন, তিনি কখনো পালিয়ে যান না! কিন্তু জান বাঁচানোর জন্য তিনি চোরের মতো পালিয়ে যান

প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে দেশের বাইরে। দেশের কোথাও তার স্থান হলো না। অত্যাচারী হাসিনার ভবিষ্যৎ দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সারা দেশে ছাত্র-জনতার বিজয়ের রেজাল্ট যেন কোনো নতুন শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাজত করুন।

৭ নভেম্বর ও ৫ আগস্ট একই চেতনা

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে আধিপত্যবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সিপাহি-জনতার সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেদিন নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ইসলামী মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একদলীয় শাসনের পরিবর্তে এদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

দীর্ঘ ১৫ বছরে গুম, খুন, ধর্ষণ মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। দেশের মানুষ গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচারকে সমূলে উৎখাত করেছে। এখন দেশে গণতন্ত্র ও দেশের মানুষকে পূর্ণভাবে মুক্ত করতে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজন আরেকটি বিপ্লবের। যা এই জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করবে। ৭ই নভেম্বর একনায়কতন্ত্র, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে যেভাবে এদেশের মানুষ সম্মিলিতভাবে গর্জে উঠেছিল একইভাবে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতা সকল আধিপত্যবাদী শক্তির মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতা হলো বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ভোটাধিকারের স্বাধীনতা। যার মূল কারিগর ছাত্ররা। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ১৬ বছরের স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে। এই স্বাধীনতা থেকে ছাত্রদের মূল চাওয়া হলো বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতির একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। যেখানে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবেন। বাংলাদেশ এখন চেতনার ওপর আছে। তাই এটাকে কাজে লাগিয়ে, তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে হবে।

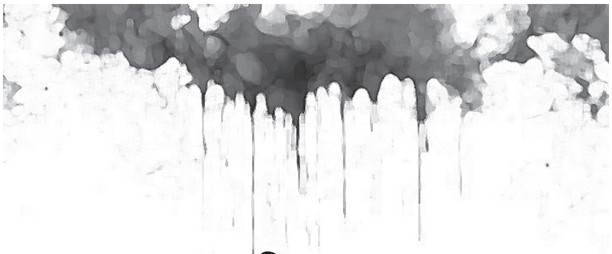
অন্তর্বর্তী সরকার

দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পেয়েছে। তার মতো অনেক বাংলাদেশি এটিকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মুহূর্তের অঙ্গীকার পূরণ করতে বাংলাদেশকে এখন পুরোনো স্বৈরাচারীকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আরও অনেক কিছু করতে হবে; অবশ্যই নষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে– দুর্নীতি, দলীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র ও দুর্বল প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর কারণে দেশের অগ্রগতি থমকে গেছে। সেইসঙ্গে নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে আড়ষ্টতা রাজনীতিকে বিষিয়ে তুলেছে।

এতে বলা হয়েছে, ড. ইউনূসের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে সঠিকভাবে নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ তৈরি করা, কিন্তু প্রথমে তাকে নির্বাচনী সংস্থা, আদালত (বিচার বিভাগ) ও সকল প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশটিকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য ড. ইউনূসের কাছে সময় খুবই কম উল্লেখ করে নিবন্ধে বলা হয়, তার সাফল্য বা ব্যর্থতা ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশির জীবনযাত্রার সফলতা নির্ধারণ করবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ড. ইউনূস একটি



> ‘আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। নিশ্চয়ই তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না।’
> – সূরা শুরা, আয়াত : ৪০

অত্যন্ত কঠিন কাজের মুখোমুখি। তার অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা উচিত আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঢেউ প্রতিরোধ করা, যা অতীতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে।

অনির্বাচিত কেয়ারটেকার সরকারের খুব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তাতে তারা বৈধতা হারাতে বা আরও খারাপ কিছু হতে পারে অথবা এর সামরিক সমর্থকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে প্রলুব্ধ হতে পারে।

সাময়িকীটিতে অবশ্য বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সহায়তা করার জন্য ভারতকে দায়ী করেছে। ভারতের লোলুপ দৃষ্টি থেকে দেশকে হেফাজত করতে হবে।

জালেমের পরিণতি

বাংলাদেশের জালেম সরকার পালাইলেও তাদের দোসর তাদের কৃত জুলুম এখনো পালায়নি। যারা জালেম তারা কখনই বাঁচতে পারেনি, এখনো পারবে না।

মহান আল্লাহ জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তা মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আবু জার গিফারি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘আমি নিজের ওপর ও বান্দাদের ওপর জুলুম হারাম করে নিয়েছি। অতএব তোমরা পরস্পরের ওপর অত্যাচার করো না।’ (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৬৯)

জুলুম তিন প্রকারঃ

এক. আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা। এটা সবচেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহ বলেন, ‘আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা পাপ।’ (সূরা লোকমান, আয়াত : ১৩)

দুই. বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পাপ করাও এক ধরনের জুলুম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালিম।’ (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

তিন. আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। নিশ্চয়ই তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না।’ (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

সবচেয়ে ঘৃণিত পাপ অন্যের ওপর জুলুম করা। জালিম তার জুলুমের পরিণতি দুনিয়াতে ভোগ করে আর পরকালের শাস্তি আরো ভয়াবহ।

জালিমের মন্দ পরিণতি : জুলুমের পরিণতি দুনিয়াতে ভোগ করতে হয়। আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, ‘অবশ্যই মহান আল্লাহ জালিমকে সুযোগ দেন। এরপর তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন : ‘এমনই তোমার রবের পাকড়াও, যখন কোনো অত্যাচারী জনপদবাসীকে তিনি পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তার পাকড়াও চরম মর্মান্তিক, অতিশয় কঠোর।’ (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৭৫)

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত : জালিম আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, ‘আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না।’ (বুখারি, হাদিস : ৭৩৭৬)। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর লানত।’ (সুরা হুদ, আয়াত : ১৮) ঐকবদ্ধভাবে আমাদেরকে জুলুম বন্ধ করতে হবে।

উপসংহার

আজকে ঐক্যের খুবই প্রয়োজন। জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলে সকল বিপদ মোকাবিলা করা সম্ভব। যদি জাতীয়ভাবে ঐক্য না থাকে তাহলে শত্রু সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং পরাজিত করে দিতে পারে। আজকে ঐক্য সময়ের খুবই প্রয়োজন, কোনো অবস্থায় বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত থাকা উচিত হবে না। ইসলাম ঐক্যের ওপর খুবই জোর দিয়েছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে ইউনাইটেড উই স্ট্রং, ডিভাইডেড উই ফল। ঐক্য হলো শক্তি বিভক্তি হলো পতন। দ্বিতীয় স্বাধীনতার সুফল ঐক্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। বিচ্ছিন্ন হলে সুফল পাওয়া যাবে না বরং তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সকলকে ছোটখাটো বিভেদ বিতর্ক ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলে সফল হবে ছাত্র-জনতার রক্তদান, সফল হবে দ্বিতীয় স্বাধীনতার স্লোগান, আদর্শভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান। আল্লাহ তায়ালা এই জাতিকে তার হারিয়ে যাওয়া আদর্শকে ফিরিয়ে আনার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করুন– আমিন।

লেখক : সাবেক এমপি



ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্র কখনোই হজম করেনি বাংলাদেশ

সরদার আবদুর রহমান

ষাট আর সত্তর দশকের সামরিক সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের অবসান ঘটানোর আন্দোলন করতে গিয়ে সেই সরকারের একগুঁয়েমির ধারাবাহিকতায় স্বাধীন হয় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ড। একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক, আত্মমর্যাদামূলক ও কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থার যে স্বপ্ন দেখেছিল এদেশের মানুষ অচিরেই সে স্বপ্ন ভেঙে যায় নতুন একটি একদলীয় স্বৈরশাসক কাঁধে চেপে বসার কারণে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময় এধরনের সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাতিকে একটি স্থিতিশীল ও টেকসই গণতান্ত্রিক শাসন থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোনো প্রকার ফ্যাসিবাদ আর স্বৈরতন্ত্রকে কখনোই হজম করতে পারেনি এই বাংলাদেশ।

১৯৭৫ সালের একদলীয় বাকশালকে উৎখাতের প্রক্রিয়া যতই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হোক না কেন তার তো বিকল্প ছিল না। আগস্ট থেকে নভেম্বরের ঘটনাবলি একইভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উল্টে দিয়েছে। তেসরা নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবকে নস্যাৎ করে দিয়েছে ৭ নভেম্বর। এরশাদীয় স্বৈরশাসনকে হটিয়ে দিয়েছে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান। আর চব্বিশের গণবিপ্লব উৎপাটিত করেছে ফ্যাসিবাদের বটবৃক্ষটিকে। এভাবে দেখা যায়, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্থিতিশীল করার জন্য গণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের ভোট ও কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে কখনো বৃথা যেতে দেয়নি এদেশের মুক্ত মনের মানুষেরা। সর্বশেষ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে দেশের ছাত্রসমাজ শোককে শক্তিতে পরিণত করে তারুণ্যের যে বিস্ফোরণ ঘটাল তা থেকে আগস্ট-এর প্রথম সপ্তাহে নতুন কিছু উপহার পেলো বাংলাদেশের ইতিহাস। দীর্ঘ দেড় দশকের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল আরেকটি ‘ঐতিহাসিক পলায়ন’-এর মধ্য দিয়ে।

পঁচাত্তরের পটভূমি

১৯৭২-৭৫ এ শেখ মুজিবের শাসনব্যবস্থার অধীনে জুলুমতন্ত্র পরিচালিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বহুল আলোচিত। আর এই তন্ত্রের অবসান ঘটে একটি পরিবারের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে এই ঘটনার যে প্রবল নেতিবাচক বয়ান উপস্থিত করা হয় এবং তার 'বিচার বিভাগীয় প্রতিশোধ' গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবিষয়ে রাজনীতিক ও লেখক অধ্যাপক গোলাম আযম যে ভাষ্য প্রদান করেন তা যুক্তযুক্তই মনে হয়। তিনি বলেন, "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্নেল ও মেজর শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে অসহায় দেশবাসীকে মুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে কোনো বিকল্প পথ না থাকায় বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের বহু দেশে সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কোথাও বিপ্লব সফল না হলে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী হিসেবে শাস্তি পেয়েছে। সফল সামরিক বিপ্লব মানে বিপ্লবীদের বিজয়। যদি সামরিক বাহিনীর অনুগত অংশ বিপ্লব ঠেকাতে ব্যর্থ হয় এবং বিপ্লবীরা বিনা বাধায় সরকার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়, তাহলে বোঝা গেল বিপ্লব সফল হয়েছে। যদি জনগণ এ পরিবর্তনে সন্তুষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এটাকে পরম সাফল্য বলা চলে। শেখ হাসিনার পিতা-মাতা ও ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বেদনাবোধ করাই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে তার প্রতি সবারই সহানুভূতি বোধ করা উচিত। এটা অবশ্য মানবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা তাকে হত্যা করেছেন, তারা তাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ হাসিল করার জন্য তা করেননি। ইতিহাস সাক্ষী এবং বর্তমানে যাদের বয়স ৪০-এর বেশি, এমন কোটি কোটি বাংলাদেশি দেশে ও বিদেশে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বেঁচে আছে যে, শেখ মুজিবের পতন দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিল। এটাকে সাধারণ হত্যা মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক।" (গোলাম আযম : জীবনে যা দেখলাম)। দেখা গেলো, যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতেই হোক- গণবিরোধী শাসনব্যবস্থাকে এদেশের মানুষ গলাধঃকরণ করতে সমর্থ নয়।

আগস্টের পর আসে নভেম্বরের পর্ব। আওয়ামী লীগ নেতাদের একটি অংশ তখন খন্দকার মোশতাক আহমেদের মন্ত্রিসভায়; বাকিরা কারাগারে কিংবা প্রাণভয়ে আত্মগোপনে। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যারা মুজিব হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, তাদেরই একটি অংশ ৩ নভেম্বর ভোরে ঘটনাপ্রবাহের গতিপথ পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ওই অভ্যুত্থানে বন্দী হন সেই সময়ের সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। কিন্তু তিন দিনের মাথায় পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত হন খালেদ মোশাররফ। সেই ঘটনাপ্রবাহ জিয়াকে নিয়ে যায় ক্ষমতার কেন্দ্রে। এখানেও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের চেতনার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু কবুল করতে রাজি নয় তারা।

পার পাননি স্বৈরশাসক এরশাদও

আশির দশকেও এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু পরিস্থিতির নায়ক স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদও পার পাননি। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন জোট গঠন ও পৃথকভাবে এই দখলদারত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় দীর্ঘ ৯ বছরব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রামের ধারা। যেটি ইতিহাসে 'স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন' নামে খ্যাত হয়ে যায়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই একটি কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম ফর্মুলা উপস্থাপন করে জামায়াতে ইসলামী। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এই ফর্মুলা প্রদান করেন। এরপর চলে লাগাতার আন্দোলন। অতঃপর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। শুরু হয় দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চার আরেক অধ্যায়।

কী করেছিল ফ্যাসিবাদীরা?

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘ টানা পনেরো বছর একাধিপত্য বজায় করে রেখেছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদীরা। তাদের মোটাদাগে যে সকল কর্মকাণ্ড থেকে গণমানবমুক্ত হয় তার মধ্যে রয়েছে, মানুষ একাধারে তার হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়ার পথ সুগম হয়। দেশের সার্বিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ দলের কুক্ষিগত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পায়। লুটপাট ও টাকা পাচারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অবসান সূচিত হয়। নির্বাচন ও ভোটব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে উদ্ধার পায়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ দেশের আনুকূল্যে গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া চলেছিল এবং একে দুর্বল করে ফেলা হয়েছিল তার অবসান হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সর্বত্র সিন্ডিকেট করে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে টাকা লুটপাট করার কৌশল বন্ধ হওয়ার পথ খুলে যায়। বিচার বিভাগকে অনুগত করে গড়ে তুলে তাকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানো হয়। আগামীতে হয়তো বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বাস্তব রূপ পেতে পারবে। এভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া, বিনোদন–সর্বক্ষেত্রে এমন অবস্থা তৈরি করা হয় যাতে একটি গোলামি ও দাসত্বমূলক প্রজন্ম সৃষ্টি করা যায়।

আওয়ামী লীগের দেড় দশক সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বাধিক শ্রুত স্লোগানগুলোর একটি হলো 'উন্নয়ন'। এমনকি এই উন্নয়নকে গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতেও দ্বিধান্বিত হয়নি এই সময়কালের ক্ষমতাসীন সরকারের নীতিনির্ধারকগণ। কিন্তু এই স্লোগানকে পুঁজি করে একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) করে। বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হতে থাকে। ব্যাংকের টাকা নির্বিঘ্নে পাচার হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটায় দুর্নীতি যেন স্বাভাবিক ও সহনীয় বিষয়ে পরিণত হয়। আমদানি-রফতানির প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার চলে।

বিদেশে অর্থ পাচার ও মানি লন্ডারিং, আমদানি-রফতানির প্রক্রিয়ায় বিদেশে টাকা পাচার, প্রণোদনার অর্থ ভাগাভাগি, ব্যাংক দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ, আমানতকারীদের সঙ্কট, রাজস্ব বিপর্যয়, কালো টাকা সাদা করা প্রভৃতি বিষয়সমূহ ছাড়াও ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। এই সময়ে

ক্ষমতার মসনদে জেঁকে বসা সেই আওয়ামী ক্ষমতাধরদের অবশেষে ক্ষমতা ছাড়তে হলো। কেবল ক্ষমতা ছাড়া নয়, প্রধানমন্ত্রী‘ তার পুরো মন্ত্রিসভা, পুরো সংসদ এবং পুরো ক্যাডার বাহিনী সমেত দলীয় নেতা-কর্মী–সকলকেই পালাতে হলো। কেউ দেশ ছেড়ে কেউ আত্মগোপনে গিয়ে জনতার রুদ্র রোষ থেকে আত্মরক্ষা করলো

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটায় দুর্নীতি নিয়েও অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গণমাধ্যমে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি ছিল বেশি আলোচিত। এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটায় দুর্নীতি, স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি, সড়ক ও সেতুতে প্রশ্নবিদ্ধ ব্যয়, স্থানীয় সরকারে দুর্নীতি, সরকারি সম্পত্তি দখল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

আলোচ্য সময়কালে সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থের হরিলুট চলতে দেখা যায়। নানা কৌশলে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব খাটিয়ে এই অর্থ লুণ্ঠনের মহোৎসব চলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কবলে পড়ে এসব বিষয় ধামাচাপা পড়ে যাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ঘটনার নায়করা একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ায় লুণ্ঠনকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনাও দুরূহ হয়ে পড়ে।

বিদেশে টাকা পাচারের জন্য আমদানি ও রফতানির মতো একটি বৈধ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। মহলটি এজন্য ব্যাংকের এলসি পদ্ধতিকে টার্গেট করে। এভাবে বাণিজ্যের আড়ালে টাকা পাচার করে থাকে মহলটি। এছাড়াও আলোচ্য সময়কালে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়ে সরকারের দেওয়া প্রণোদনার অর্থও হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে। এই সময়কালে আর্থিক বিষয়ের অন্যান্য খাতগুলোর মতোই ব্যাংকঋণ ও শেয়ারবাজারে এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করে। শত শত কোটি টাকার ঋণ নিয়ে তা ব্যাংকে ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে এর গ্রহীতারা অদৃশ্য হয়ে যায়। শেয়ারবাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটে নিয়েও বহাল তবিয়তে থাকেন দাগাবাজরা। এমনকি কেউ কেউ পুরস্কৃতও হন। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষত স্বাস্থ্য খাতে বিপুল মাত্রার দুর্নীতি ঘটে আলোচ্য সময়ে। সরকারি কেনাকাটায় বিশেষত ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য কয়েকগুণ বেশি দেখিয়ে বাড়তি টাকা আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ উঠে। সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলোর লোকদেখানো তৎপরতা থাকলেও দুর্নীতির মাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন কুলিয়ে উঠতে পারে না। প্রভাবশালীদের সুতার টানে এসব পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদি চক্করে আবর্তিত হতে থাকে।

শেখ হাসিনার পলায়ন

ক্ষমতার মসনদে জেঁকে বসা সেই আওয়ামী ক্ষমতাধরদের অবশেষে ক্ষমতা ছাড়তে হলো। কেবল ক্ষমতা ছাড়া নয়, প্রধানমন্ত্রী‘ তার পুরো মন্ত্রিসভা, পুরো সংসদ এবং পুরো ক্যাডার বাহিনী সমেত দলীয় নেতা-কর্মী–সকলকেই পালাতে হলো। কেউ দেশ ছেড়ে কেউ আত্মগোপনে গিয়ে জনতার রুদ্র রোষ থেকে আত্মরক্ষা করলো।

এই ঐতিহাসিক পলায়নের পটভূমিতে ছিল নানান ঘটনাবলি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, শেখ হাসিনা অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিদের জন্য কোটাপ্রথা সৃষ্টি করেন। এই কোটার জালে আটকে পড়া সাধারণ শিক্ষার্থীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল ২০১৮ সালে। সেই আন্দোলন সফল হয় স্বেচ্ছাচারী হাসিনার রাগের মাথায় পুরো কোটা বাতিল করে দেয়ার মাধ্যমে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও জাতি দেখলো একঝাঁক তরুণ নেতৃত্বের বিস্ফোরণ। যে বিস্ফোরণ অত্যাচারী একনায়কের সিংহাসন তছনছ করে দিয়েছে মাত্র ৩৬ দিনের আন্দোলনে!

একজন বিশ্লেষকের মতে, পতিত সরকার যখন বুঝতে পারলো যে, কোটাপ্রথা বাতিল করায় সরকারি চাকরিতে মেধার তোড়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদেরকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন আদালতের কাঁধে ভর করে পুনরায় কোটাপ্রথা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল পতিত-স্বেচ্ছাচারী শেখ হাসিনার শেষের শুরু। গত চব্বিশের জুনের ৫ তারিখে উচ্চ আদালত কোটাপ্রথা বাতিলের প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই ছাত্ররা এর প্রতিবাদ শুরু করে।

প্রেক্ষাপট: দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দ্বিতীয় দফার টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১ জুলাই ২০২৪ থেকে। অহিংস এই আন্দোলন সহিংস হয় ১৫ জুলাই থেকে। আন্দোলনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ঘটনাবলি নিম্নরূপ:

- ১ জুলাই, সোমবার : কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান।
- ৩ জুলাই, বুধবার : ঢাকার শাহবাগ মোড় দেড় ঘণ্টার মতো অবরোধ। একই দাবিতে আরো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবরোধ।
- ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার : সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ

ঘোষণার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে স্থগিত হয়নি। দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক ও ঢাকায় শাহবাগ মোড় পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ।

- ৫ জুলাই, শুক্রবার : ছুটির দিনেও বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ।
- ৬ জুলাই, শনিবার : 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির আওতায় দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ছাত্রধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক।
- ৭ জুলাই, রোববার : 'বাংলা ব্লকেডে' স্থবির রাজধানী। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা।
- ৮ জুলাই, সোমবার : ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ।
- ১০ জুলাই, বুধবার : প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন, 'আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম, রাস্তায় স্লোগান দিয়ে রায় পরিবর্তন হয় না। এটা আজকে না, আমি যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ছিলাম, তখন একটি মামলায় বলেছিলাম, রাস্তায় স্লোগান দিয়ে রায় পরিবর্তন করা যায় না।'
- ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করছেন। এটি অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি। সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ''শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।''
- ১২ জুলাই, শুক্রবার : কোটা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল শেষে শাহবাগ মোড় অবরোধ।
- ১৩ জুলাই, শনিবার : কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা পরিস্থিতিকে সহিংস করে তোলে।
- ১৪ জুলাই, রোববার : গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বললেন, 'কোটা বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।' শেখ হাসিনা আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে?' একই দিনে পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সব গ্রেডের কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন।
- ১৫ জুলাই, সোমবার : কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যাঁরা 'আমি রাজাকার' স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বেন বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন।
- ১৬ জুলাই, মঙ্গলবার : রংপুরে আন্দোলনকারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের বুলেটে নিহত হওয়ার সচিত্র ছবি প্রকাশ। সারা দেশে দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ। বিকেলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আন্দোলন যাবে, আন্দোলন আসবে। কিন্তু ছাত্রলীগ থাকবে। সবকিছুই মনে রাখা হবে এবং জবাব দেওয়া হবে। একটি ঘটনাও জবাব ছাড়া যাবে না।'
- ১৭ জুলাই, বুধবার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা। ছুটির দিনেও ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রবিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ। রাত সাড়ে সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার ভাষণ।
- ১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার : আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ সারা দেশ ছিল প্রায় অচল। সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন।
- ১৯ জুলাই, শুক্রবার : কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা। রাজধানী ঢাকা কার্যত অচল, পরিস্থিতি থমথমে। রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন। ইন্টারনেট-সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ।
- ২০ জুলাই, শনিবার : দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন। সাধারণ ছুটি ঘোষণা। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গুলি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ চলবে। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ। কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলায় পরিস্থিতি সহিংস।
- ২১ জুলাই, রোববার : সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের রায়–কোটাপ্রথা হিসেবে মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ; মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ; ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ নির্ধারণ।
- ২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার : প্রধানমন্ত্রীর মেট্রোস্টেশন পরিদর্শন। বললেন, 'আমি জনগণের কাছে বিচার চাইছি।'
- ২৬ জুলাই, শুক্রবার : এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা। নাহিদ ইসলামসহ কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে ডিবির হেফাজতে। অপর দুই সমন্বয়ক হলেন আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদার। সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি দেওয়ার পর ১৯ জুলাই মধ্যরাতে

খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া থেকে নাহিদকে তুলে নেওয়া হয়।

- ২৭ জুলাই, শনিবার : কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরও দুই সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। ১১ দিনে গ্রেফতার ৯ হাজার ১২১ জন।
- ২৮ জুলাই, রোববার : ডিবির হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয়জন সমন্বয়ক এক ভিডিও বার্তায় সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বলেন। মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন পর সচল।
- ২৯ জুলাই, সোমবার : জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ১৪ দলের বৈঠকে। ৬ সমন্বয়ক ডিবি হেফাজতে। 'জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না'-এক শুনানিতে এ মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট।
- ৩০ জুলাই, মঙ্গলবার : হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেমে রাঙিয়েছেন অনেকে। 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের।
- ৩১ জুলাই, বুধবার : 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির পর বৃহস্পতিবারের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাংশের। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ'।
- ১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার : জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। ডিবি হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়।
- ২ আগস্ট, শুক্রবার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি পালিত।
- ৩ আগস্ট, শনিবার : সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে উত্তাল বাংলাদেশ। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হন শিক্ষার্থীসহ হাজারো জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে রাজধানীসহ দেশের ৩৩টি জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ।
- ৪ আগস্ট, রোববার : সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে ১৮ জেলায় ব্যাপক সংঘাত। ১১৪ জন নিহত।
- ৫ আগস্ট, সোমবার : রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা। গণভবন, সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে অসংখ্য মানুষ। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন ও আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে আগুন।
- ৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন নোবেলজয়ী ড. ইউনূস। এদিন রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন।

সবমিলিয়ে শেষ অবধি এই আন্দোলনে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রসহ বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষ এমনকি শিশুও নিহত হয়। আহত হয় পঁচিশ হাজারের বেশি মানুষ। আহতদের কেউ কেউ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় ফ্যাসিবাদের নির্যাতনের সাক্ষী হিসেবে।

বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের ঘটনাবলি বিশ্বময় তোলপাড় সৃষ্টি করে। ঢাকায় বিক্ষোভ দমনে জাতিসংঘের লোগো সংবলিত ভারি যানবাহন ব্যবহার করায় এটি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে বিশেষত জাতিসংঘের অবস্থান ছিল সমালোচনামুখর। এছাড়া আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। এসময় ভারত সরকারের অবস্থান ছিল ধোঁয়াশায় ভরা। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ নিয়ে চলে কিছু পাল্টাপাল্টি বক্তব্য। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় দেশসমূহ ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। অপরদিকে ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান প্রভৃতি আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে কোনো প্রকার অবস্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এমনকি কোনো প্রতিক্রিয়াও তারা প্রকাশ করেনি।

এ বিষয়ে একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. আবদুল লতিফ মাসুম তার একটি কলামে বলেন, "অর্ধশতাব্দী আগে ৭ নভেম্বর যে বিপ্লব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নতুনভাবে নিশ্চিত করেছিল, সেটি আজও প্রাসঙ্গিক। ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাইয়ের গৌরবময় বিপ্লবের সাথে রয়েছে এর চেতনা, সংযোগ ও পরম্পরা। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছাত্ররা সূচনা করেছিল, জনগণের রক্তদানের মধ্য দিয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল এই গণবিপ্লব। আর এই বিপ্লবকে পরিপূর্ণতা দানে এগিয়ে এসেছিল আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনী। গণবিপ্লবের সফলতার পেছনে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তারা বিভিন্ন সেনা আবাসিক এলাকায় যে আন্দোলন করেছেন, তা সেনা নেতৃত্বকে আন্দোলিত করেছে। আবারো সেনাপ্রধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অবদান রেখেছেন। তিনি সঠিক দায়িত্ব পালন না করলে, আরেকটি রক্তক্ষয়ের দিকে ধাবিত হতে পারত দেশ। ছাত্র-জনতা ও সেনাবাহিনীর সেই সংযোগ, ধারাবাহিকতা ও নেতৃত্ব ৩৬ জুলাইয়ের বিপ্লবকে করেছে মহিমান্বিত। এই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে প্রত্যাশিত ইস্পাত কঠিন ঐক্য যদি বহমান থাকে তাহলে কখনোই পরাজিত হবে না বাংলাদেশ।"

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট ও গ্রন্থপ্রণেতা

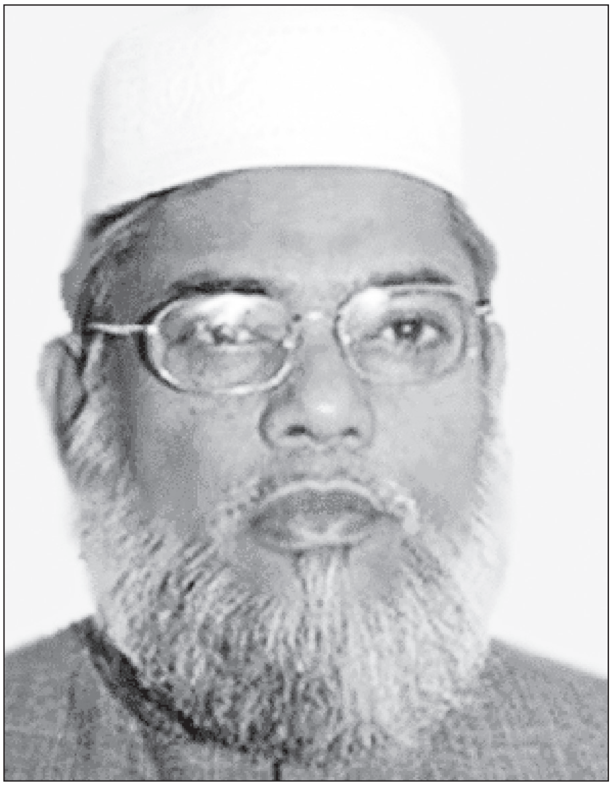
ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে পরিবারের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ

আলী আহমাদ মাবরুর

২০১৫ সালের ২১ নভেম্বর রাত ৮টা। আমি তখন পুরানা পল্টনস্থ আইনজীবীদের চেম্বারে। পরিবারের বাকি সবাই উত্তরাস্থ বাসভবনে। হঠাৎ বাসা থেকে ফোন– আমাদেরকে (পরিবারকে) নাকি শেষ সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেছে। ডেপুটি জেলার শিরিন বাসায় ফোন দিয়ে রাত ৯টার মধ্যে কারাগারে পৌঁছতে বলেছে। আমি সাথে সাথে বাসায় ফোন করে বললাম, 'আমি তো কাছেই আছি, পল্টনে। এখান থেকে পুরনো ঢাকার জেলখানায় যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। আপনারা বরং জলদি বের হোন।' এরপরই আমি সংগঠনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর মরহুম মকবুল আহমেদ এবং তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল ডা. শফিকুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করলাম এবং তাদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করলাম। শেষ সাক্ষাতে আমাদের জন্য সাংগঠনিক কোনো পরামর্শ আছে কিনা। আইনজীবীদেরও জানালাম। তারপর অজু করে কারাগারের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মোট ২৫ জন সদস্য-সদস্যা সেদিন কারাগারে গিয়েছিলাম। রাত ১১টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছাই। ভেতরে প্রবেশের পরে প্রয়োজনীয় তল্লাশি শেষে রাত ১১:২০ মিনিটে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেল রজনীগন্ধায় পৌঁছাই। রজনীগন্ধায় সেলের একেবারে ডান কোনায় ৮নং সেলে আব্বা থাকতেন। এর আগেও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা রহিমাহুল্লাহ ও শহীদ মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানও সেই ঘরটিতেই ছিলেন।

আমার আগে আব্বার এক নাতি, আমার আম্মা আর বোন আব্বার ঘরে পৌঁছান। আমি ৪ নম্বর ব্যক্তি হিসেবে পৌঁছাই, সাথে অন্যরাও। আমি ধারণা করেছিলাম, যেহেতু এত লোক যাচ্ছি শেষ সাক্ষাৎ। আব্বা হয়তো আমাদের জন্য তৈরি হয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু আমরা সেলের বাইরের করিডোরে বা সেলের ভেতরে দাঁড়ানো বা বসা কোনো অবস্থাতেই আব্বাকে পেলাম না। ভেতরে তাকিয়ে দেখি, আব্বা শুয়ে আছেন। পরে বুঝলাম গভীর ঘুমে আছেন। ডান দিকে কাত হয়ে গালের নিচে হাত দিয়ে সবসময় যেভাবে ঘুমাতে দেখেছি সেভাবেই তিনি ঘুমাচ্ছেন। গায়ের ওপর কাঁথা নেই, ছোট রুমটির ফ্লোরে জায়নামাজের ওপর শুয়ে আছেন। মাথার নিচে কোনো বালিশও নেই। আমার বোন, আমরা সবাই আব্বা আব্বা বলে ডাকছি। আর আমার ভাইয়ের ছেলেরা ডাকছে দাদা দাদা বলে। কিন্তু আব্বার কোনো সাড়া নেই। যেন ঘুমের সাগরে তলিয়ে আছেন তিনি।



শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

এভাবে প্রায় মিনিট খানেক ডাকাডাকির পর আব্বা একটু গুঙিয়ে বললেন, কে, কে আব্বা বলে? তারপর আমাদের দেখে বললেন, ও তোমরা আসছো। এত রাতে কী ব্যাপার? তোমাদের কি কারা কর্তৃপক্ষ ডেকেছে? এটা কি শেষ সাক্ষাৎ? ততক্ষণে তিনি উঠে বসেছেন। আমাকে তো জেল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।

কিছুটা সময় তিনি বসেই থাকলেন। মনে হলো গভীর ঘুম থেকে উঠার জন্য, পাশাপাশি আমাদের উদ্দেশ্যে তার দিক নির্দেশনাগুলো গুছানোর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইছেন।

আমরা তাকে উত্তর দিলাম, জি আব্বা, আমরা আমাদের শহীদ হতে যাওয়া বাবার কাছে আসছি। আমার বোন বলল, আমরা আমাদের মর্যাদাবান পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমাদেরকে ওরা আজ শেষবারের জন্য আপনাকে দেখার জন্য ডেকেছে। তিনি এভাবে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। বসে বসেই আমাদের কথা শুনলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ।'

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন, দাঁড়ালেন। ফিরোজা রঙের গেঞ্জি, সাদা নীলের স্ট্রাইপযুক্ত পায়জামা পরে ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল খুঁজলেন। পরে খুঁজে পেয়ে স্যান্ডেল পরে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন কে কে আসছো, কয়জন, আমিই একটু দেখি (সেই সময় লাইটের আলো কম থাকায় ভেতর দিকে ভালো দেখা যাচ্ছিলো না। সেলের লোহার দরজার বাইরে নেটের দরজা দিয়ে লাগানো ছিল। পরে আমার বড় ভাই সেই দরজাটি খুলে দিলেন। আমরা পরিবারের সদস্যরা আগে একে একে সালাম দিলাম, তারপর আত্মীয়রা। আমার বড় ভাইরা প্রত্যেকের নাম বলে দিচ্ছিলেন যে, কারা সেদিন সাক্ষাতে গিয়েছিল।

কিন্তু আব্বা বললেন, "দাঁড়াও আমিই দেখে নেই। তারপর সবাই একটু জোরে নিজেদের নাম বলে উপস্থিতি জানান দিলেন। কিন্তু আব্বা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে কাছে ডেকে তাদের সাথে হাত মিলাতে শুরু করলেন। একে একে সবাই শিকের ভেতর দিয়ে হাত মেলালেন।

প্রত্যেকটা মানুষের সাথে তিনি তাদের খোঁজ খবর নিলেন। যার যা সমস্যা সেটা নিয়েই তিনি আলাপ করলেন। প্রত্যেকে সেল দিয়ে বের হয়ে থাকা তার দুটি হাত ছুঁয়ে সালাম দিলেন। কেউবা চুমু দিলেন। শেষ করে বললেন, কারও সাথে মুসাফাহ করা বাদ যায়নি তো?

আব্বা দাঁড়ানোর পর আমি নিজ থেকেই একটা সূচনা বক্তব্য দিলাম। বললাম, "আব্বা আপনি শহীদ হতে যাচ্ছেন। আপনি এর মাধ্যমে নিজেকে ও আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করে যাচ্ছেন। আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করেছেন, আখিরাতেও সম্মানিত করতে যাচ্ছেন। অতএব মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাকে আপনার আব্বা, আমার দাদা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী (রহ) ইসলামী আন্দোলনের জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। আমি মনে করি এরকম একজন ওয়াকফ হওয়া মানুষের সর্বোত্তম ইতি আজ হতে যাচ্ছে। কেননা আপনি আপনার ছাত্রজীবন, যৌবন, মাঝবয়স সব আন্দোলনের জন্য ব্যয় করে এখন দ্বীন কায়েমের জন্য গলায় ফাঁসির দড়ি নিচ্ছেন। আপনার শাহাদাতে সবচেয়ে খুশি হবেন আপনার পিতা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী। কেননা আপনি তার দেওয়া ওয়াদা অনুযায়ী জীবন যাপন করে আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন।"

আব্বা এরই মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সেলের দরজায় স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়েছেন। এরপর তিনি প্রথম শব্দ করলেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম কথা বললেন, "তোমরা জেনে রেখো, কারা কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত আমাকে জানায়নি যে তারা আজ আমার ফাঁসি কার্যকর করতে যাচ্ছে। এটা কত বড় জুলম?" তখন একটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আব্বা বললেন, কান্নাকাটির দরকার নেই। আমি কিছু কথা বলবো।

এরপর তিনি অত্যন্ত স্বভাবসুলভ তেজোদীপ্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে, মাথা উঁচু করে অনেকটা ভাষণের ভঙ্গিমায় শুরু করলেন, 'নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম।' উপস্থিত অন্যরা তখনও একটু আবেগ প্রকাশ করছিল, আব্বা আবারও বললেন, "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যিদুল মুরসালিন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'আদ।"

আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া। জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে তারা এই সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। জেল কর্তৃপক্ষ আসলে অসহায়। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন এবং আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন।

'আইসিটি অ্যাক্ট' যার আওতায় আমার বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে, যদিও এটা অবৈধ ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে, এই বিচারের সময় আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের খুবই সীমিত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন, সাক্ষ্য আইন কিছুই প্রযোজ্য ছিল না। সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমাকে ট্রাইব্যুনাল ৬নং চার্জে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। তারা চার্জ ১-কে চার্জ ৬-এর সাথে মিলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আপিল বিভাগ আমাকে চার্জ ১ থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। চার্জ ৬-এ তারা আমার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে। অথচ ট্রাইব্যুনাল শুধু চার্জ ৬-এর জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। এই চার্জে সাক্ষী মাত্র একজন। সে বলেনি, যে কোন বুদ্ধিজীবীকে আমি হত্যা করেছি। কোনো বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তানও এসে বলতে পারেনি যে আমি কোন বুদ্ধিজীবীকে মেরেছি এবং কোনো বুদ্ধিজীবী পরিবারও আমার রায়ের পরও দাবি করেনি যে তারা তার পিতা হত্যার বিচার পেয়েছেন।

আমার অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আমি নাকি আর্মি অফিসারদের সাথে বসে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু যে সাক্ষী এসেছে সেও বলেনি যে আমি কবে কোন আর্মি অফিসারের সাথে কোথায় বসে এই পরামর্শ করলাম?

সাক্ষী বলেছে, সে নাকি আমাকে, নিজামী সাহেব ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেখেছে। সে আমাদের চিনতো না। পরে আমাদের নাম শুনেছে। অথচ এই অভিযোগটি গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে আনাই হয়নি। নিজামী ভাইকে যাবজ্জীবন দিয়ে শুধু আমাকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

আমি নিশ্চিত যে আমার মৃত্যুদণ্ডের রায় আগে থেকে কনফার্ম করেই তারপর আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করা হয়েছে। (আমরা সকলে তখন চিৎকার করে বললাম শেইম)

আমাকে আমার পরিবার, সংগঠন ও দেশবাসীর কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য, কাপুরুষ প্রমাণ করার জন্য দিনভর রাষ্ট্রীয়ভাবে মিথ্যাচারের নাটক করা হয়েছে। এই জালিম সরকারের কাছে ক্ষমা

চাওয়ার প্রশ্নই আসে না (এই সময় তার কণ্ঠে প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভের সুর প্রকাশ পায়)। আমি নির্দোষ, নির্দোষ এবং নির্দোষ। আমাদের আজ তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতে যাচ্ছে।

কত বড় স্পর্ধা তাদের যে তারা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করার দাবি করে। অথচ তাদের নিজেদের ভেতর মানবতা নেই। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় একজন মানুষকে মধ্যরাতে তুলে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে বলে এই তাদের শেষ সাক্ষাৎ এবং এরপরই তার ফাঁসি কার্যকর করা হবে। তারা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো লোককেও একইভাবে মাঝরাতে তুলে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছে। এটা কেমন মানবতা?

তোমরা শুনে রাখো, তোমরা চলে যাওয়ার পর আজ যদি আমার ফাঁসি কার্যকর করা হয় তাহলে তা হবে ঠান্ডা মাথায় একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা। তোমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। আজ আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর এই অন্যায় বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকের বিচার আল্লাহর দরবারে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তোমাদের কারও কিছু করতে হবে না।

তোমাদেরকে আজ আমি আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমাদের সময় জন্মতারিখ সঠিকভাবে লিখা হতো না। আমাদের শিক্ষকেরাই ছাত্রদের জন্ম তারিখ বসিয়ে দিতেন। আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমার জন্ম ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭, ২৭ রমজান। আমার চেয়ে শেখ হাসিনা মাত্র ১ মাসের ছোট। সে আমাকে ভালোভাবেই চিনে। সে ভালো করেই জানে আমি কোনো অন্যায় করিনি কেননা তার সাথে আমার দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে।

আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরাহ করেছি অসংখ্যবার। আর আল্লাহর রহমতে হজ করেছি ৭ থেকে ৮ বার। আমার বাবার কবর পবিত্র নগরী মক্কায় জান্নাতুল মাওয়াতে। সেখানে তার কবর উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা:) এর পাশেই। বেশ কয়েকজন সাহাবির কবরও আছে আলাদা ঘেরাও করা, তার ঠিক পাশে। এখানে অনেক নবী রাসূলদের কবরও আছে। আমি এই পর্যন্ত যতবার ওমরাহ করেছি, যাদেরকেই সাথে নিয়েছি তাদের প্রত্যেককেই সেই কবর দেখানোর চেষ্টা করেছি।

ছোট ভাই আলী আকরাম মো: ওজায়ের তখন সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "নয়া ভাই, আমাকেও আপনি নিয়ে গেছেন।" (উল্লেখ্য আব্বার সব ভাই-বোনেরা তাকে নয়া ভাই বলেন। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় চতুর্থ ভাইকে নয়া ভাই বলা হয়)।

আব্বা আবার বললেন, আমার তো ইচ্ছা হয়, আব্বার পাশে গিয়ে আমি থাকি, সেখানেই আমার কবর হোক। (একটু হেসে বলেন) তবে এখন সেটা বললে তো কারাগার কর্তৃপক্ষ একটু বিপদে পড়েই যাবে। যাক এই ব্যাপারে আমি তো আমার বড় ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছি, সেই সবার সাথে আলাপ করে ঠিক করে নেবে। ওটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে বলে মনে করি।

এর মাঝেই তার মেঝ ছেলেকে ডিউটিরত ডেপুটি জেলার বারবার সময় নিয়ে ইঙ্গিত করছিল। আমার মেঝ ভাই তাই আব্বাকে জানায় যে, "আর ৫ মিনিট সময় আছে। জেল প্রশাসন তাই বলছে।" আব্বা তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা আমাকে চিনেন। জানেন। এতদিন ধরে দেখেছেনও। আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে আরেকটু মানবিক আচরণ আশা করি। আমি আমার জরুরি কথা হয়ে গেলে ১ মিনিট সময়ও বেশি নেব না।"

তখন উপস্থিত সুবেদার জানান, "স্যার আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন সব সময়, আমরাও আপনার সম্মান রাখার চেষ্টা করেছি।"

এরপর আব্বা আবার শুরু করলেন, "এখানে আমার সন্তানেরা আছো। এখন আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু কথা বলব। তোমরা নামাজের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস থাকবা। তোমরা সবসময় হালাল রুজির ওপর থাকবা। কষ্ট হলেও হালাল রুজির ওপর থাকবা। আমি ৫ বছর মন্ত্রী ছিলাম, ফুল কেবিনেট মন্ত্রী ছিলাম। আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে আমি সেখানে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে, পরিশ্রম করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। কেউ আমার ব্যাপারে বলতে পারবে না যে আমি অন্যায় করেছি। অনেক দুর্নীতির মধ্যে থেকেও আমার এই পেটে (নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে) এক টাকার হারামও যায়নি। তোমরাও হালাল পথে থাকবা। তাতে একটু কষ্ট হলেও আল্লাহ বরকত দিবেন।

আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক সিলাই রেহিমি। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে মিলে মিশে চলবে। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই নামাজ পড়বে, অনেকেই কম। কেউ কেউ হালাল উপার্জনের ব্যাপারে অত্যধিক কড়া হবে আবার কেউ কেউ একটু দুর্বল থাকবে। শরিয়তে দুই রকম। আজিমাত এবং রুকসাত। আজিমাত হলো খুবই কড়া, কোনো অবস্থাতেই সে হারামের কাছে যাবে না। আর রুকসাত হলো পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য একটু ঢিল দেবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে কারও আয়ে সমস্যা থাকবে, কারও নামাজে দুর্বলতা থাকবে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য সবার সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখে মিলেমিশে চলা। আমি সবসময় এভাবে চলেছি এবং তাতে ভালো ফল পেয়েছি।

হাদিসে আছে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতিবেশীর হক আদায় করবে। আমার ঢাকার বাসা, ফরিদপুরের বাড়ির প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

ঢাকার বাসায় তোমরা কীভাবে থাকবে সে ব্যাপারে তো আমি আগেই লিখে দিয়েছি। মৌলিক কোনো চেঞ্জ দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী মূল ভিত্তি ঠিক রেখে তোমরা সুবিধা মতো এদিক ওদিক চেঞ্জ করে নিও। ফরিদপুরের বাড়ি নিয়েও যেভাবে বলে দিয়েছি, সেভাবেই তোমরা কাজ করবে। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কখনো কোনো ঝামেলা হয়নি। তোমরাও মিলেমিশে থাকবে। এইসব দুনিয়াবি বিষয়াদি নিয়ে কোনো সমস্যা করবে না। শান্তি রক্ষায় কাউকে যদি এক হাত ছাড়তেও হয়, তারপরও কোনো ঝামেলা করবে না, মেনে নিবে।

বেশি বেশি করে রাসূল (সা)-এর জীবনী ও সাহাবীদের জীবনী পড়বে। আমি জানি তোমরা পড়েছো, কিন্তু তাও বার বার পড়বে। আর সাহাবীদের জীবনীর ওপরও ভালো বই আছে। আগে পড়েছো

জানি, তাও তোমরা পড়ে নিও।

আমি আমার সন্তানদের ওপর সন্তুষ্ট। তোমাদের ভূমিকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট। দেখো আমি এখানে পেপার পত্রিকা নিয়মিত পাই না। তারপরও আমি যা চাই, যা ভাবি তোমরা তা করে ফেলো। যেমন আজকের সকালের প্রেস কনফারেন্স। এটা অনেক ভালো হয়েছে। আমাকে ছাড়াই তোমরা যে পরামর্শ করে এত সুন্দর একটা কাজ করে ফেলেছো, তাতে আমি অনেক খুশি হয়েছি। আসলে হৃদয়ের একটা টান আছে। আমি এখান থেকে যা ভাবি তোমরা কীভাবে যেন তাই করে ফেলো। তোমরা আগামী দিনেও এভাবেই বুদ্ধি করে মিলে মিশে পরামর্শ করে কাজ করবে।

আইনজীবীদেরকে আমার ধন্যবাদ ও দোয়া দেবে। তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাদের ভূমিকার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট। আইনজীবীরা যেভাবে পরিশ্রম করেছেন, অবিশ্বাস্য। ওনারা যদি টাকা নিতো তাহলে ৫-১০ কোটি টাকার কম হতো না। কিন্তু তারা অলমোস্ট বিনা পয়সায় সাহসিকতার সাথে এই আইনি লড়াই চালিয়ে গেছেন।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির এই জনপদের জন্য বড় ধরনের একটি নেয়ামত। আমার জানামতে এই সংগঠন দুটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা সংগঠন। এই সংগঠনের ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট। গত কয়েক বছরে অনেক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছে, হাজার হাজার নেতাকর্মী আহত হয়েছেন, আমার মতো জেলখানায় আছে কয়েক হাজার মানুষ। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবির বিগত ৫ বছরে যে ভূমিকা রেখেছে, যে স্যাক্রিফাইস করেছে তা অতুলনীয়। আমার শাহাদাত এই দেশে ইসলামী আন্দোলনকে সহস্রগুণ বেগবান করবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুইজন ছাড়া বাকি সবাই দরিদ্র। তারা মূলত অভাবের তাড়নায় এবং বিপদে পড়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম, তোমরাও তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ রাখবে না।

তোমাদের আম্মাকে দেখে শুনে রাখবে। সে আমার চেয়ে ভালো মুসলমান, ভালো মনের মানুষ। এই ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার সম্মানিত শ্বশুর-শাশুড়িকে স্মরণ করেন। শাশুড়ি তখনও জীবিত ছিলেন এবং সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "শাশুড়ি তো মায়ের মতোই। আপনি আমাকে যেভাবে স্নেহ করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না।"

তারপর তিনি বললেন, "আমার জানামতে শহীদের মৃত্যু কষ্টের হয় না। তোমরা দোয়া করবে যাতে আমার মৃত্যু কম কষ্টের মধ্য দিয়ে হয়। আমাকে যেন আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ পাহারা দিয়ে নিয়ে যান। এরপর তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করেন। মুনাজাতে তিনি জালিমের ধ্বংস কামনা করেছেন। পরিবারের জন্য আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যেন তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে তার পরিবারকে ঢেকে রাখেন।

ছোট মেয়ে আদরের মেয়েকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেন। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, "তুমি মন খারাপ কোরো না। আমার আগে আমার মা, বাবা, ছোট ভাই শোয়ায়েব এবং বড় মেয়ে মুমতাহিনা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আমিও তাদের কাছেই যাচ্ছি।"

আমার বড় ভাই তখন বললেন, "আপনি তো শহীদ হতে যাচ্ছেন। জান্নাতে শহীদের প্রবেশের সময় অনেকের জন্য আপনার সুপারিশ করার সুযোগ থাকবে। আপনি সেই তালিকায় আমাদের রাখবেন।"

তারপর পুত্রবধূদের উদ্দেশ্য করে আব্বা বললেন, "আমার বউমাদের আমি সেভাবে আদর করতে পারিনি। এই সময়, তিনি সকল পুত্রবধূর বাবা-মা'র খোঁজখবর নেন এবং তাদের প্রত্যেককে তার পক্ষ থেকে সালাম জানান। পুত্রবধূদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। বিশেষ করে ছোট বউমাকে আমি খুব একটা সময় দিতে পারিনি। কেননা ওর বিয়ের কয়েক দিন পরেই তো আমি গ্রেফতার হয়ে এখানে চলে আসি। এই সময় তিনি সকল পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বলেন, আমি তোমাদের প্রতি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

আব্বা বলেন, "ঠিক একইভাবে আমি আমার মেয়ে জামাই আর মেয়েকেও আমি সেভাবে সময় দিতে পারিনি। ওদেরকে নিয়ে একবেলাও একত্রে খাবার খাওয়ারও সুযোগ হয়নি। এই সময় তিনি মেয়ে জামাইকে উদ্দেশ করে বলেন, বাবা তোমার ভূমিকায় ও দায়িত্বপালনে আমি সন্তুষ্ট। তোমার মা বাবাকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। প্রতি-উত্তরে মেয়ে জামাই বলেন, "আব্বু আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করব।"

জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের সাথে আমার কোনো ভুল আচরণ হলে আপনারা আমায় মাফ করে দেবেন। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সেবকদের তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং তার নিজের পিসির টাকাগুলো সেবকদের মাঝে প্রয়োজন মাফিক বণ্টন করে দেন এবং সেই ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

নিজামী ভাই ও সাঈদী সাহেবসহ আরও যত দায়িত্বশীল তখন কারাবন্দী ছিলেন এবং বাইরে যারা মুক্ত অবস্থায় ছিলেন তাদের সবাইকে তিনি সালাম পৌঁছে দিতে বলেন। দেশবাসীকে তিনি সালাম দেন এবং সকলের কাছে দোয়া চান। সর্বশেষে তিনি তার শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি সকলের সাথে একে একে হাত মিলিয়ে বিদায় জানান।

তারপর আমরা তার রুম থেকে বেরিয়ে আসলাম। সেই যে আসার পথে ঘুরে তাকিয়ে তাকে দেখে আসলাম, সেটাই আমার বাবার শেষ জীবন্তকালীন ছবি। যা কোনোদিন ভুলতে পারব না। ভুলে যাব না ইনশাআল্লাহ। ভুলে যাওয়া সম্ভবও নয়। আমার বাবার জন্য, এই স্বচ্ছ মনের মানুষটির জন্য আপনারা দোয়া করবেন। প্রাণভরে দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম



ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। আল-কুরআনে ইসলামকে বলা হয়েছে দ্বীন। ইসলাম মানব জীবনের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যা সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই ইসলাম সুষ্ঠু কাঠামো ও মঙ্গলময় বিধান পেশ করছে। মানবজীবনের কোনো দিকে বা পর্যায়ের কোনো সমস্যার সমাধান অন্যত্র খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন নেই, ইসলাম এর অনুমতিও দেয় না। ইসলাম প্রকৃতিসঙ্গত ও অকৃত্রিম কল্যাণময় জীবনবিধান। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামী অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র উৎস হচ্ছে আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা) প্রদর্শিত মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আল-ইসলাম, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতির একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি ইসলামী জীবনদর্শনে সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা।[১]

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলামী স্কলার ও অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ আকরাম খান তার বিখ্যাত গ্রন্থ .০An Introduction to Islamic Economics-এ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিত করণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। (Islamic Economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of the earth on the basis of co-operation and participation.)"[২]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম ওমর চাপড়ার মতে, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্পাপ্য সম্পদের বরবাদ ও বণ্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা অযথা ও সমষ্টি অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন রকম ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে। (Islamic Economics is that branch of knowledge which help to realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that i sin conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.)[৩]

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কোনো না কোনো বিশ্বাস বা মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। ইসলামী অর্থনীতিও

ঐ মূনীতির ওপর ভিত্তিশীল যার ওপর ইসলামী সমাজব্যবস্থা ভিত্তিশীল।

একটি প্রধান মূলনীতি ব্যক্তির অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার স্বাধীনতা ও মালিকানা যে ব্যবস্থা থাকে তাকে 'পুঁজিবাদ' বলা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উৎপাদনের নীতির কারণেই একটি অর্থব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে কেন্দ্র করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক নীতি ইসলাম দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ :

ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বধীনতা : ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে ব্যক্তি বা মানুষ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক নয়। সম্পদের আসন্ন মালিক আল্লাহ। মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদের আমানতদার। মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে শুধু ভোগ-দখল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। একজন ব্যক্তির ইচ্ছামতো যথেচ্ছভাবে সম্পদ ভোগ ও কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই।

হালাল ও হারামের বিস্তৃত সীমারেখা : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে হালালকে গ্রহণ এবং হারামকে বর্জন। ইসলামী মতাদর্শের মৌল সূত্র অনুযায়ী উৎপাদন কর্মকাণ্ড, সম্পদ ভোগ, ব্যবহার ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হারামকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে। ইসলামী অর্থনীতি তার যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরিয়াহর নীতি অনুসরণ করে। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থনীতিতেই ভোগ, উৎপাদন, বণ্টন এবং সেবামূলক কার্যকলাপে পুনরায় সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ করার প্রয়াস চলছে। এতে হালাল-হারাম থেকে বেঁচে চলা হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ হারাম পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং ভোগ করা যাবে না।

সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হবে। অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করবে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই পরিমাণ সামগ্রীর কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে, অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ। ইসলামী শরিয়তে হারাম ঘোষিত কাজের মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশি কঠোর। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবে সুদ আজ সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে ছেঁয়ে ফেলেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করে ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সকল প্রকারের সুদই নিষিদ্ধ। লেনদেন সম্পূর্ণরূপে সুদ (রিবা) মুক্ত হবে।

জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা। জাকাত হচ্ছে ইসলামী সমাজের বিত্তশালী অংশের দায়িত্ব এবং অসহায়, দুর্বল, বঞ্চিত মানুষের অধিকার। জাকাত একটি ইবাদত, একটি দ্বীনি দায়িত্ব ও আল্লাহর অধিকার। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জাকাতের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। জাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়। ফলে বেকার সমস্যা কম থাকে, শ্রমিকের চাহিদা থাকায় মজুরি বৃদ্ধি পায়, ভিক্ষুক সমস্যা সৃষ্টি হয় না, অসহায়-দুস্থ সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার শ্রেণি সংগ্রাম, হানাহানি, সংঘাত ইত্যাদি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে। জাকাত দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ মানবতার সামাজিক নিরাপত্তার স্থায়ী ব্যবস্থা।

সুবিচার ও ইনসাফ-আদল-ইহসান প্রতিষ্ঠা : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে সমাজ জীবনে ইহসান (ন্যায়সঙ্গত আচরণ, পরোপকার) ও আদল (সুবিচার/ন্যায়বিচার/ন্যায্যতা) প্রতিষ্ঠাকে করণীয় হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন বলছে, আল্লাহ তোমাদের আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন।[৪] এ নির্দেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষসহ সকলের প্রতি আদলের (সুবিচার) ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রতি সুবিচারের সাথে সাথে ইহসানের (সু-আচরণ) কথাও বলা হয়েছে। তাদের প্রতি সুবিচারের অর্থ অন্যের জন্য নিজের অধিকার পূর্বেই ছেড়ে দেওয়া। এ কাজকে বিবেচনা করা হয় উন্নত পর্যায়ের গুণ হিসেবে। ন্যায্যতা ও পরোপকারের মাধ্যমে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

জবাবদিহিতা : জবাবদিহিতা– Complete Accountability to Allah ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। সবার মধ্যে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করার অনুভূতি থাকতে হবে। আল্লাহর আদালতে বিচার হবে সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক; এতে প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকার্যের ফলাফল পূর্ণভাবে দেওয়া হবে, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ : নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি আল্লাহ বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদের পৃথিবীতে ইমাম ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই।[৫] এ হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহর সাধারণ নীতি। উত্তরাধিকারী করার অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাতে বঞ্চিতরা পৃথিবীতে ন্যায়সঙ্গতভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এ নীতির ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতিতে বঞ্চিতদের বেতন, আনুষ্ঠানিক সুবিধাদি, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের জীবন সুন্দর করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়।

টীকা:

১. *মুহাম্মদ আযীযুল হক, আধুনিক বিশ্ব ইসলামী ব্যাংকের ধারণা উপস্থাপন মনীষীদের অবদানের একটা মূল্যায়ন (সেমিনার প্রবন্ধ), আধুনিক বিশ্বে ইসলাম (সংকলন) মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সম্পাদিত (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৯), পৃ. ১২৫। মুহাম্মদ আযীযুল হক, (জীবনকাল ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫-১২ নভেম্বর ২০২০), বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ইসলামী ব্যাংকার ছিলেন।*
2. *Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, IIIT4 IPS, 1994, P-33.*
3. *Dr M. Umer Chapra, what is Islamic Economics, Journal of Islamic Banking and Finance, V01-18, July-September 1991, No 3, P-17-18.*
৪. *সূরা আন নাহল ১৬ : ৯০*
৫. *সূরা আল কাসাস : ২৮ : ৫-৯*

লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

ড. ইকবাল কবীর মোহন

৫ নভেম্বর নির্বাচনে জিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি তিনি জো বাইডেনের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ট্রাম্পের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও বিরল ঘটনা। তার কারণ, একবার পরাজিত হয়ে একই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া আমেরিকার ইতিহাসে বিরল। ট্রাম্প ইতিহাস সৃষ্টি করে দ্বিতীয়বার শুধু ক্ষমতায়ই ফেরেননি, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তা ছাড়া মার্কিন ভোটাররা এবার এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল, বিতর্ক এবং স্ক্যান্ডাল ছিল যার নিত্যসঙ্গী এবং যার বিরুদ্ধে ঝুলছে চারটি মামলা এবং একটিতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আরেকটি মামলার রায় অপেক্ষমাণ। ২০১৬ সালে ট্রাম্প যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখনও হিলারি ক্লিনটনের প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের কাছে তিনি ছিলেন অনুল্লেখ্য এবং প্রায় নিস্প্রভ। অথচ সেবার পপুলার ভোটে হিলারির চেয়ে ৩০ লাখ ভোট কম পেয়েও সবাইকে চমকে দিয়ে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার চেয়ে এবারের প্রেক্ষাপট ছিল আরও অনিশ্চিত। সেবার প্রেসিডেন্ট হলেও তার মেয়াদের পুরো সময় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা নীতি ও পদক্ষেপের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। একবার তিনি ইমপিচমেন্টের সম্মুখীন হয়েও ভাগ্যের জোরে রক্ষা পান। নিজ দলের মধ্যেও তার ইমেজ ছিল ভঙ্গুর। এতকিছুর পরও ট্রাম্পের এবারের বিজয় ছিল অপ্রত্যাশিত।



ট্রাম্পের বিজয়ের কারণ

একজন বিতর্কিত এবং অনিশ্চিত স্বভাবের ব্যক্তি এবং মামলায় শাস্তি পেয়েও ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট কেন নির্বাচিত হলেন তা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমদিকে প্রায় সকল জরিপে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এগিয়ে থাকলেও আমেরিকার জনগণ দিনের শেষে একজন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখে নিতে সম্মত হয়নি। ২০১৬ সালে হিলারির মতো শক্তিশালী এবং নিশ্চিত বিজয়ের কাছাকাছি গিয়েও তিনি মহিলা হওয়ার কারণে হেরে যান। এই হিসাবটিতে ডেমোক্র্যাটদের ব্যর্থতা তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। অন্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসনকালের নানা ব্যর্থতা। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউজের দখল নিতে

সাহায্য করেছে।

তা ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মনের কথাগুলোর প্রতিধ্বনিত করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে জনগণ সমর্থন দিয়েছে। তার কঠোর অভিবাসন নীতি গ্রহণ, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান, জলবায়ু নীতিতে কাটছাঁট, গর্ভপাতের অধিকার রদ করা, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, কর কমানো, মূল্যস্ফীতি রোধ, চীনের বেলায় ৬০% পর্যন্ত কর বাড়ানোর ঘোষণা, মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ এবং আমেরিকা প্রথম-এসব স্লোগান মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করেছে, যা কমলা হ্যারিস ততটা পারেননি। তা ছাড়া গাজা-ইসরাইল যুদ্ধের ব্যাপারে ট্রাম্পের কৌশলী নীতি এবং এক্ষেত্রে বাইডেন তথা রিপাবলিকানদের চরম ব্যর্থতা একদিকে ট্রাম্পকে ইহুদিদের ভোট পেতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি আরব-আমেরিকান মুসলিম নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে অত্যন্ত কৌশলে ট্রাম্প এগিয়ে গেছেন এবং হোয়াইট হাউজের দৌড়ে সফল হয়েছেন।

নির্বাচনী তথ্য ও ফলাফল

মোট ভোট সংখ্যা : ২৪ কোটি ৪০ লাখ। আগাম প্রাপ্ত ভোট : ৭ কোটি ৭০ লাখ। মোট অঙ্গরাজ্য : ৫০টি। গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান রাজ্য : ৭টি। ইলেকটোরাল কলেজের ভোটসংখ্যা : ৫৩৮টি। জয়ী হতে প্রয়োজন : ২৭০ ভোট। কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার : ৩ কোটি ৪৪ লাখ। হিসপানিক ভোটার: ৩ কোটি ৬২ লাখ। এশিয়ান ভোটার : ১ কোটি ৫০ লাখ। ট্রাম্পের ইলেকটোরাল ভোট লাভ : ৩১২টি। কমলা হারিসের : ২২৬টি।

ট্রাম্পের এবারের বিজয়ের ফলে বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা হ্রাস, ইউক্রেন-রাশিয়া ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান ইত্যাদি নিয়ে ইতোমধ্যে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা এবং দোলাচলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ট্রাম্পের বিজয়ের কারণে বিশ্ব রাজনীতি একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে বলে অনেকে মনে করছেন।

গাজা ও লেবানন সঙ্কটের সমাধান প্রসঙ্গ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ট্রাম্প একচেটিয়া ইসরাইলের অন্ধ সমর্থক। তার মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য সদস্যদের নাম নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তাতে বেশির ভাগ মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারকই ইসরাইলের সমর্থক বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে মনোনীত হয়েছেন পিট হেগসেথ, যিনি একজন জায়োনিস্ট। তিনি বলেন, 'জায়োনবাদ ও আমেরিকানিজমস হলো পশ্চিমা সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রথম সারির প্রতিরক্ষা কবচ।' তাই তিনি অবশ্যই ইসরাইলের ঘোর সমর্থক হিসেবে ইসরাইলের পক্ষে ট্রাম্পকে পরামর্শ দেবেন। অন্যদিকে জাতীয় উপদেষ্টা পদে মনোনীত মাইক ওয়াল্টজ মনে করেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইসরাইলকে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়া, তার মানে ইসরাইলের যত টাকা লাগবে যুক্তরাষ্ট্র দেবে। এভাবে তার দলের লোকেরাও একই আদর্শে বিশ্বাসী। ফলে বর্তমান সরকারের নীতি যে ইসরাইলকে সমর্থন করা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা বা নীতিনির্ধারকরা ইসরাইলপন্থী হলেও বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ট্রাম্পকে মেনে চলতে হবে। বাইডেন প্রশাসন খোলাখুলিভাবে ইসরাইলকে যাবতীয় সহযোগিতা করলেও তেলআবিব গাজা ও লেবানন অভিযানে কতটা সফল হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ইসরাইল কয়েকটি ফ্রন্টে একই সাথে লড়াই করার কারণে দেশটির তথাকথিত আত্মরক্ষার নীতি ও কৌশল দারুণভাবে মার খাচ্ছে। গাজায় অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে এলাকাটিকে প্রাণহীন করে ফেলা এবং দক্ষিণ লেবানন ও পশ্চিম তীর দখল করার ইসরাইলের যে আকাঙ্ক্ষা তাতে অন্ধভাবে সমর্থন দেওয়া ট্রাম্পের জন্য কঠিন হবে। গাজায় ও লেবাননে বর্বর ইসরাইলি হামলা পরিচালনা করতে যে বিপুল অর্থ ও মানবিক ক্ষতির মধ্যে ইসরাইল পড়েছে, তাতে অকৃপণ সাহায্য দেওয়ার মতো পরিস্থিতি আমেরিকার আছে কিনা তা নিয়ে অনেকেই ভাবছেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ট্রাম্প ইসরাইলকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন, তা নিয়ে শঙ্কার জায়গা যেমন আছে, তেমনি আমেরিকার সামর্থ্য কতটা আছে তা অবশ্যই মার্কিন প্রশাসন ভেবেচিন্তে অগ্রসর হবে বলে আমার বিশ্বাস। গাজার হামাস ও অন্যসব প্রতিরোধ গোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণ, ইয়েমেনের হুতিদের জলপথে অব্যাহত আক্রমণ এবং সিরিয়া ও ইরাকের যোদ্ধাদের প্রক্সি লড়াই সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইলের সামরিক এবং অর্থনৈতিক ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এই যুদ্ধে জেতার কোনো লক্ষণ নেই বলে খোদ ইসরাইলি বিশেষজ্ঞরাই মন্তব্য করেছেন।

এই অবস্থায় মার্কিন প্রশাসন তার বন্ধু দেশ ইসরাইলের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করতে আরো কতটা অগ্রসর হবে- তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের ভেতর ইসরাইলের হামলা পরিচালনা করা এবং অবিরামভাবে গাজা, পশ্চিম তীর এবং দক্ষিণ লেবাননে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নড়েচড়ে বসেছে। তাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে সেখানকার দেশগুলোকে হাতছাড়া করতে যুক্তরাষ্ট্র চাইবে না। ফলে ইসরাইলের নীতিতে ইহুদি সমর্থক আমেরিকা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সাবেক বিশ্লেষক মাইকেল মালুফ মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি সে পথে নাও হাঁটতে পারেন। কারণ, তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ট্রাম্প সম্প্রতি নেতানিয়াহুকে বলেছেন, 'এসব শেষ করুন। লড়াই বন্ধ করুন। শর্তে আসুন।' এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেবেন বলে মনে হয় না। তবে বাস্তবতা কোনদিকে অগ্রসর হবে তা এখনই হলফ করে বলা যাবে না।

রুশ-আমেরিকা সম্পর্ক

ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু পরিকল্পনা করা। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন বিষয়কে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সাথে ইতোমধ্যেই চরম শত্রুতামূলক সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছে। রাশিয়ার অভিযোগ অনুযায়ী মূলত ন্যাটোর নামে আমেরিকাই রাশিয়ার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। অঢেল অর্থ ও অস্ত্র দেওয়া ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বয়কট ও নিষেধাজ্ঞার



বেড়াজালে রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় রাশিয়াকে কাবু করার মার্কিনি যে নীতি, তা থেকে ট্রাম্প বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন বলেই মনে হয়। কেননা, নির্বাচনী প্রচারণায় ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেসব জোরালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মধ্যে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি এমনও বলেছেন, 'আমি নির্বাচিত হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই যুদ্ধ বন্ধ করব।' আঙ্কারার সোশ্যাল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব মুরাত ইয়েসিলতাস এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তার (ট্রাম্পের) কথা ও প্রতিশ্রুতি যদি সত্যি হয়, তাহলে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধ শেষ করার মার্কিন প্রয়াসে মার্কিনিরা কৌশলগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া ইউরোপের ওপর ট্রাম্পের প্রভাব হারানো এবং ন্যাটোও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' তবে ট্রাম্পের পুরোদমে ক্ষমতায় বসার পরই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

ইরান-মার্কিন উত্তেজনা

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইরানের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে একটি ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। আর এই উত্তেজনায় আমেরিকা সরাসরি ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। গাজা ও লেবাননে ইসরাইলি বর্বরতা পরিচালনা ও ক্রমাগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে আমেরিকার শুধু সমর্থনই নেই, রয়েছে অর্থ, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনও। আমেরিকার প্রতিটি সরকার হোক রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট সবাই ইসরাইলের বিষয়ে অন্ধের মতো এক হয়ে কাজ করছে। আর এরই প্রেক্ষাপটে ইরান, যারা গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনি ও প্রতিরোধ যোদ্ধা হামাসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে অনড়, তার সাথে আমেরিকার নীতিগত বিরোধ অনিবার্য। ইরান বিপ্লবের পর থেকেই এই সম্পর্ক তিক্ততার মধ্য দিয়ে চলে আসছে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র (২০১৮ সালে) একতরফাভাবে পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ফলে পারমাণবিক কর্মসূচির সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেয় তেহরান।

এরপর থেকেই ইরান তার পারমাণবিক কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি জোরদার করে। আর ইতোমধ্যেই দেশটি পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলেছে বলে জোর প্রচারণা রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে গাজা ও লেবাননে ইসরাইলের যে বর্বর ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞ এবং ধ্বংসলীলা চলছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে আগামী দিনগুলোতে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে এ বিষয়ে নির্বাচনের ঠিক একমাস আগে ট্রাম্পের দেওয়া একটি মন্তব্য থেকে আশার খানিকটা আলোও প্রত্যক্ষ করা গেছে। ইরান যখন ইসরাইলে হামলা চালিয়েছিল তখন ট্রাম্প বলেছিলেন, 'বিশ্ব আগুনে জ্বলছে এবং মার্কিন নেতৃত্ব তা প্রতিরোধ করছে না।' বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'এই দুই ব্যক্তি আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।' ট্রাম্প আরো বলেছিলেন, যদি আমি দায়িত্বে থাকতাম তাহলে ৭ অক্টোবর কখনোই সংঘটিত হতো না, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হতো না।'

ট্রাম্পের কথাগুলো যদি সঠিক হয় এবং তা তার মনের কথা হয়, তাহলে এর প্রতিফলন আমরা হয়তো অচিরেই দেখতে পাব। আগামী ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা লাভের পরই তার আসল রূপ প্রতিফলিত হবে। তবে ইরানের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক উন্নয়নের আপাতত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরানের সাথে কোনো না কোনো বোঝাপড়া যদি যুক্তরাষ্ট্র করতে না চায়, বা করতে না পারে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। আর তা হবে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

চীন বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক পরাশক্তি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এই উচ্চতায় উঠে এসেছে চীন। বাইডেন আমলে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে চীন-মার্কিন সম্পর্ক এগিয়ে গেছে। মোটা দাগে এসময়ে দু' দেশের মধ্যে মোটেও সুসম্পর্ক ছিল না। তবে যতটুকু অনুমান করা যায়, দু' দেশের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ পররাষ্ট্রনীতির

যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণেশীয় বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান নির্বাচনের আগে এক মন্তব্যে বলেন, 'কমলা হ্যারিস বিজয়ী হলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। আর ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে পরিস্থিতি ভিন্নও হতে পারে।' তার এই মন্তব্যের সাথে অনেকেই সহমত পোষণ করেননি। কারণ, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের রিপাবলিকানদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমেরিকার বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করার কোনো কারণ নেই

অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে। তবে চীনের প্রতি দেশটির দৃষ্টিভঙ্গি এবং চীনের অর্থনীতিকে চেপে ধরার নীতি দু' দেশের সম্পর্ককে আরো জটিল করে তুলতে পারে। ট্রাম্প তার নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মধ্যে চীনের পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ কর আরোপের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এটা হয়তো তার 'আমেরিকা প্রথম' এই নীতির সরলীকরণ বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকে ধারণা করছেন। এই নীতি বহাল থাকলে দু' দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক না হয়ে আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হবে। এতে বিশ্বের দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর চীনের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। বহির্বিশ্বের সাথে চীনের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। বিশেষ করে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো চীনের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ এবং প্রভাব দুটোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ট্রাম্পের ক্ষমতায় আরোহণের পর এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েক দশক ধরেই ইউরোপের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। ইউরোপে 'মার্কিন প্রতিশ্রুতি' কমে যাওয়ার শুরুটা অনেক দিনের। বাইডেন যুগে তার কোনো অগ্রগতি হয়নি। এরই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের বিজয়ী হওয়ার পরও ইউরোপের জন্য ভালো কোনো খবর নেই বলে অনেকের অভিমত। কারণ, আমেরিকার কাছে ইউরোপের গুরুত্ব ততটা বেশি নয়। তাই নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে প্রখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস ভিংকুর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ট্রাম্প বা কমলা হারিসের যেই ক্ষমতায় আসুন না কেন, কয়েক দশকের পুরনো ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় ইউরোপীয়দের উচিত হবে, ইউএস প্রেসিডেন্ট নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা না করা, বরং নিজেদের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হওয়া। বিশ্বের বিপজ্জনক মঞ্চে কীভাবে একা টিকে থাকা যায়, তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।' তার এই মন্তব্য থেকে ইউরোপ-মার্কিন সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়।

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন ও বাংলাদেশের স্বার্থ

আমরা সবাই অবগত আছি যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশের উন্নয়ন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম পার্টনার। এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ আমেরিকার স্বার্থে গুরুত্ব বহন করে। তাই আমেরিকার ক্ষমতার পরিবর্তনে বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হবার অনেক কারণ থাকে। আমেরিকা এখন বাংলাদেশের জন্য শীর্ষ রেমিট্যান্সের গন্তব্য। পোশাক রফতানির বড় গ্রাহক যুক্তরাষ্ট্র। তা ছাড়া আর্থিক, সামরিক এবং কৌশলগত অনেক বিষয় যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জন্য অনন্য এক দেশ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং মার্কিন মসনদে ট্রাম্পের আরোহণ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা রকম আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। অনেকে এটাকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আশা নিরাশার সাথে যুক্ত করতে চাইছেন। সহজ করে বলতে গেলে পতিত আওয়ামী সরকার ও তার নেতা-কর্মীরা ট্রাম্পের বিজয়ে অস্বাভাবিক উল্লসিত। ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে এবং আওয়ামী লীগ ভারতের সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও পছন্দের দল হিসেবে দলটি ট্রাম্পের আনুকূল্য পেয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছে। বিপরীত পক্ষে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকার (তিনি ব্যক্তিগতভাবে) হিলারি পরিবার এবং রিপাবলিকান দলের ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় ক্ষমতা হারাবেন অথবা আমেরিকার সমর্থন হারাবেন বলে জোর প্রচারণা চলছে।

এরই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণেশীয় বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান নির্বাচনের আগে এক মন্তব্যে বলেন, 'কমলা হ্যারিস বিজয়ী হলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। আর ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে পরিস্থিতি ভিন্নও হতে পারে।' তার এই মন্তব্যের সাথে অনেকেই সহমত পোষণ করেননি। কারণ, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের রিপাবলিকানদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমেরিকার বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করার কোনো কারণ নেই। বিশ্বে অত্যন্ত পরিচিত এবং জনপ্রিয় হওয়ার কারণে জনাব ইউনূসের সাথে ডেমোক্র্যাট অনেক নীতিনির্ধারকের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ট্রাম্পের বিজয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব জনাব সফিকুল আলমের মতে, ট্রাম্পের বিজয়ে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পর্ক আরো উচ্চ শিখরে পৌঁছাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে সবই নির্ভর করছে বিষয়টি নিয়ে সরকারের তৎপরতা এবং কূটনৈতিক সাফল্যের ওপর। আমাদেরও প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের দ্বি-পাক্ষিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক নিকট ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

লেখক : শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এবং প্রাক্তন ব্যাংকার

মুক্তিযুদ্ধ, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান আর দ্বিতীয় রিপাবলিকের স্বপ্ন

মীর্যা গালিব



১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন না পেলেও পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে আওয়ামী লীগই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। পিপিপির জুলফিকার আলি ভুট্টো আর মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট ৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে।২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে আটক করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অফিসিয়ালি ড্রাফট করে।

যেহেতু ১৯৭০ এর নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ফলাফল মেনে না নিয়ে ২৫ মার্চ সামরিক অভিযান চালানোর ফলে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কাজেই গণতন্ত্র ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের বিপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার’ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে এই চার নীতিকে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগের ছয় দফা, ১৯৭০ এর নির্বাচনের মেনিফেস্টো ও প্রচারণা এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র– এর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা অ্যাজেন্ডা বা নীতি হিসেবে ছিল না।

বরং ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় রেডিও এবং টেলিভিশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে খুব স্পষ্টভাবে ইসলামের প্রতি তার কমিটমেন্ট-এর কথা বলেছিলেন। ‘মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোনো আইনই এদেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।” আওয়ামী লীগ বাদে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডা হিসেবে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই জনগণের ম্যান্ডেট পায়নি। কাজেই তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা কোনো বিচারেই এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা না। ১৯৭০-এর নির্বাচনে শুধু আওয়ামী লীগ ছয় দফার প্রশ্নে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। কাজেই শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি, ৭০ এর নির্বাচনের ইশতিহার এবং ৭০ এর নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোন ধরনের আকাঙ্ক্ষা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি '৭২-এর সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র আসলো, এইটাও সত্যিকার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি, '৭০ এর নির্বাচনী ইশতিহার কিংবা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় রেডিও এবং টেলিভিশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইখানে সমাজতন্ত্রের কথা একবার মাত্র আসছে। 'আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।' এই ভাষণে পাকিস্তানের তৎকালীন কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তান কীভাবে শোষণের শিকার তার ডিটেইলস বর্ণনা আছে তথ্য-উপাত্তসহ। এই প্রেক্ষাপটে বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবের চিন্তায় সমাজতন্ত্র মূলত শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্থে ছিল। '৭০ এর নির্বাচনের ইশতিহারেও শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী অর্থনৈতিক সিস্টেমের কথা ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র ও ইসলামকে বাদ দিয়ে একটি টোটালিটারিয়ান সিস্টেম হিসেবে সমাজতন্ত্রের আইডিয়া ছিল না। শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা যে ইসলামেরও মূলনীতি এটিও আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন জায়গায় বলেছে। একটি টোটালিটারিয়ান সিস্টেম হিসেবে সমাজতন্ত্রের আইডিয়া ছিল বামপন্থী দলগুলোর। ১৯৭২ সালের সংবিধানে আরও রেভ্যুলুশনারি পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য বামপন্থী দলগুলোর চাপ ছিল আওয়ামী লীগের ওপরে। ছাত্র ইউনিয়ন পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত '৭২-এর সংবিধানকে ইন্টেরিম সংবিধান হিসেবে দেখেছে। এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ সংবিধানের প্রস্তাবনায় শুধু 'সমাজতন্ত্র' উল্লেখ করে বাকি দাবিগুলোকে ইগনোর করে। সেই দিক থেকে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সংবিধানে যে পরিবর্তন আনেন 'সমাজতন্ত্র– যাহার অর্থ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার', সেইটাই ১৯৭০ সালের গণ আকাঙ্ক্ষার সাথে অধিক মানানসই ছিল। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এইটা স্পষ্ট হয় যে, একটি গণতান্ত্রিক মডেলের সরকারব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থের বাইরে সমাজতন্ত্রের অন্য কোনো মডেল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

দুঃখজনক হলো যে, ১৯৭২ সালের গণপরিষদে সংবিধানের যে ড্রাফট করা হয় তাতে গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ-এর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র এই দুটো নীতি উল্লেখ করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ম্যান্ডেট ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা ছিল একটি অগণতান্ত্রিক ডিসিশন। এইটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, '৭২-এর সংবিধান শুরু থেকেই একটি অগণতান্ত্রিক সংবিধান। এই অগণতান্ত্রিক সংবিধানের মধ্য দিয়ে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর প্রবক্তারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলামের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে এক ধরনের ইসলামোফোবিক রেইসিস্ট সিস্টেম তৈরি করে। ধর্মকে প্রাইভেট স্পেসে সীমাবদ্ধ করা হয়, পাবলিক স্পেসে ধর্মচর্চাকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাদ্রাসায় পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য করা হয়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর কালচারাল চিহ্ন যেমন দাড়ি, টুপি, হিজাব, বোরকাকে এলিট কালচারাল সমাজে ট্যাবুতে পরিণত করা হয়। কিন্তু এই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে ইসলামের এক গভীর ভূমিকা আছে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তারা ভাষা আর ধর্ম মিলিয়ে বাঙালি মুসলমান। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেহেতু এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে অস্বীকার করার জন্য অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠাই তাদের একমাত্র নিয়তি হয়ে উঠেছে। একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে উপেক্ষা করে '৭২ এর সংবিধান লেখা, সকল দলকে নিষিদ্ধ করে সমাজতান্ত্রিক বাকশাল গঠন, ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদদের অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া, আর ১৫ বছরের একটি ফ্যাসিস্ট সরকার ব্যবস্থা এই দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর রবীন্দ্রনাথ ছিল এই ফ্যাসিস্ট 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' এর তিন আইকন ।

পরবর্তীতে, জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে সংবিধানে দুটো বড় পরিবর্তন আনেন।

এক, সেক্যুলারিজমের পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ঈমানকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

দুই, সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে ব্যাখ্যা করা।

এই দুটো পরিবর্তনই ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং এর আগে পরে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা ভাবনার সঠিক রেপ্রেজেন্টেশন ছিল। ইন্টারেস্টিংলি, বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির একটা বিশাল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ১৯৭৭-এর এই পরিবর্তনকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হিসেবে দেখেন এবং এই পরিবর্তনের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার জোর এত বেশি যে, খোদ বিএনপিও জোর গলায় '৭৭ এর সংবিধান পরিবর্তনের ক্রেডিট দাবি করে না।

২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণভ্যুত্থান ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে আমাদের নতুন করে বাংলাদেশকে বিনির্মাণের সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে আমরা যদি একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বানাতে চাই, তাহলে দ্বিধাহীনভাবে আমাদের ইতিহাস-এর পর্যালোচনা করতে হবে। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর ইসলামোফোবিক, রেইসিস্ট এবং তার ফলশ্রুতিতে ফ্যাসিস্ট যে চরিত্র তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। '৭২ এর সংবিধান যে সমকালীন গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল না এই কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে। এই দেশের আপামর জনগণের যে বিশ্বাস, কালচার, মূল্যবোধ তাকে ধারণ করে, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-কে ধারণ করে, আমাদেরকে দ্বিতীয় রিপাবলিক তৈরি করতে হবে। এই দ্বিতীয় রিপাবলিকে আমাদের লাল সবুজের পতাকা হয়ে উঠুক প্রত্যেক বাংলাদেশির গর্বের পরিচয়। আগামীর বাংলাদেশ গণমানুষের হয়ে উঠুক, এই লক্ষ্যেই হোক আমাদের রাজনীতি।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পাঁজরবিদ্ধ কবিতা

মোশাররফ হোসেন খান

এইতো সকল দানবীয় দাঁতালকে রুখে দিয়ে
শিরদাঁড়া উঁচু করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে
চব্বিশের অগ্নিশ্বাসী বারুদস্তম্ভ।
তাদের দুর্বিনীত আকাশস্পর্শী কেশাগ্র বাতাসে দুলছে কাশফুলের মতো।

নদী তার গতিপথ খুঁজে পেয়েছে।
স্রোতধারা খুঁজে পেয়েছে তার মূল উৎস।
আর আমাদের পলল মৃত্তিকার বুক খুঁজে পেয়েছে প্রসন্ন প্রশান্তি।

আলোকে যারা ভয় পেত,
এখন তারা গর্তের অন্দরে মুখ লুকিয়ে নাভিশ্বাস তুলছে।
কালমৃত্যু তাদেরকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে রেখেছে।

নিয়তির পরিহাস উপেক্ষা করতে পারে কে?

আকাশের সর্বাঙ্গ জুড়ে এই যে রক্ত-লাল পতাকা---
এটাই আমাদের অমলিন বিজয়ের স্মারক।

যে ভোলে ভুলুক---
আমি আমার রক্তের কালিতে
সূর্যের করপুটে লিখে দিলাম একটি নাম---
লাল চব্বিশের পাঁচই আগস্ট।

আমি তো একজন শব্দাস্ত্রের কারিগর মাত্র।
স্বদেশ যদি চায়---
আমি আবারো আমার শব্দাস্ত্র দ্বিধাহীনে উজাড় করে দেবো।

হে পাঁজর উৎসর্গকারী বিপ্লবীরা,
তোমাদের প্রতি আমার সুপ্রসন্ন
অভিবাদন...!





সবুজ বিজয়ের স্বপ্ন

বিলাল হোসাইন নূরী

গুলমোহরের লাল রঙে জ্বলে শহীদী উপাখ্যান
আত্মার পাখি কার নাম ধরে গায় বিজয়ের গান?
কোন সুদূরের অস্ত-লালিমা উদয়ের কথা বলে
কিসের গন্ধে মোহিত যুবক মৃত্যুর পথে চলে?

মৃত্যু! মৃত্যু! ঝাঁজালো মৃত্যু! দ্রোহের উপন্যাস
কালের গর্ভে লিখে রাখে বহু-বর্ণিল ইতিহাস।

এই তো এখানে শরীয়ত-দুদু মুক্তির দাঁড় টানে
নিসার আলীর বাঁশের কেল্লা ধ্বংস-প্রলয় আনে
গত হলো কত পূর্বপুরুষ, আসমানছোঁয়া নাম
তেরশ নদীর কল-কল্লোলে সংগ্রাম! সংগ্রাম!
শতাব্দী যায়, শতাব্দী আসে আমরা করিনি ভয়
রক্ত-কাফন ভেদ করে জাগে প্রাণের অভ্যুদয়।

তবুও এখানে বারবার জাগে নব্য মীরজাফর
এ যেন শোকের আম্রকানন,পলাশীর প্রান্তর।

একনায়কের স্বৈরবিলাস আকাল এনেছে ডেকে
মানচিত্রের রেখায় রেখায় হতাশার জাল এঁকে।
তারপরও এক বিজয় এসেছে স্বস্তির নিঃশ্বাসে
নফল রোজার উৎসব নামে জনতার বিশ্বাসে।

নগ্ন-প্রতাপে ফ্যাসিবাদ ফেরে বয়ানের বিভ্রমে
এ মাটির যত সারনির্যাস শুষে নেয় ক্রমে ক্রমে
সত্য এবং মিথ্যার ভেদ নিঃশেষ হতে হতে
দেশ ও জাতির ভাগ্য গড়ায় অন্ধকারের স্রোতে।
তারুণ্য জাগে দীপ্ত আভায়, তুমুল তূর্য-বানে
দু'হাত ছড়িয়ে বুক পেতে দেয় দুরন্ত অভিযানে
নতুন বিজয়, নতুন সূর্য এনেছে আলোর দিন
কলিজার তাজা রং থেকে ফোটে স্বপ্ন অন্তহীন।

এবার একটি বিজয় আসুক– সবুজ খুব সবুজ
ততটা সবুজ– যেমন সোনার মদীনার গম্বুজ!

অনিবার্য যাযাবর

হেলাল আনওয়ার

কতটুকু নির্মোহ হলে সুখ পাওয়া যায়?
ঠিক ততটুকু নির্মোহ হতে চাই।
আমি জানি, থেতলে যাওয়া স্বপ্নগুলো
আমার প্রতিপক্ষ হতে পারে।
মাথার উপরে মেঘের সামিয়ানা
চুইয়ে পড়া জলফোঁটা কান্নার কফিন।
এখন আর রাতে জোসনা দেখি না
হাসনাহেনা, কামিনী কিংবা নিশিগন্ধা
আমাকে স্ববেগে আলিঙ্গণ করে না।
দিনের যৌবন ছোঁয়া বাঁশির সুরও হারিয়ে ফেলেছি কাঁটাঘেরা উর্বর ক্ষেতে।
পাখিরা আমাকে ডেকেছিল আজো, ভোরে
ঘুম ভাঙানোর উল্লাসে নাচতে বলে–
গাইতে বলে-অমূল্য হাসিতে
সবিনয়ে বলেছি– মাফ করো!
অন্তরীক্ষের তরঙ্গ ফুঁড়ে শোনাতে পারিনি সুখ-স্বপ্নের মোহনীয় সুর।
সময়ের করিডোর ছেড়ে
গন্তব্যহীন যাত্রা আমার।
আর কোনো মোহ নেই, প্রত্যাশার মতো স্বপ্নাতুর চোখ
জিঞ্জীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছি
সকল শৃঙ্খল মুক্ত এই আমি
অনন্ত স্বাধীনতার পদ্মদিঘির পাদপ্রান্তে
আমি এক নির্মোহ লোকালয়ের
অনিবার্য যাযাবর।

যুগে যুগে স্বৈরাচার ও তাদের করুণ পরিণতি

আহমেদ আফগানী

[শেষ পর্ব]

আইয়ুব খান

ব্রিটিশদের কাছে এই উপমহাদেশের মুসলিমরা স্বাধীনতা পেলেও আইয়ুব খানের মতো স্বৈরশাসকদের জন্য সেই অর্জন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে।



বিরাজনীতিকরণ : আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই পাকিস্তানে বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিরোধীদের জব্দ ও হয়রানির জন্য দু'টি (PODO I EBDO) বিবর্তনমূলক আইন জারি করেন। কেবল এবডো আইনের মাধ্যমেই ৮৭৭ জন রাজনীতিবিদ অযোগ্য ঘোষিত হয়। এছাড়া সরকার সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতিবিদদের অত্যাচার করে স্বেচ্ছা নির্বাসন বা 'অবসর'-এর ঘোষণা আদায় করতো। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সোহরাওয়ার্দী, যিনি রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান।[1]

জামায়াত নিষিদ্ধ : ১৯৬২ সাল থেকে জামায়াত স্বৈরশাসনের বৈধতা দানকারী আইয়ুবের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে এবং জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন শুরু করে। প্রতিটি প্রদেশে মিছিল মিটিং ও সমাবেশ করতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় মামলা হামলা ও নির্যাতন চলতে থাকে সংগঠনটির বিরুদ্ধে। সবশেষ ১৯৬৪ সালে ৬ জানুয়ারি আইয়ুব খান জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেন। একইদিন মাওলানা মওদূদীসহ শীর্ষ ৬০ জন জামায়াত নেতাকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে অনেক বাঙালি নেতাও ছিলেন, যেমন : অধ্যাপক গোলাম আযম, মাস্টার শফিকুল্লাহ, মাস্টার আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুর রহমান ফকির, শামসুল হক প্রমুখ।[2]

একনায়কত্ব : আইয়ুব শাসনামলে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক দলের স্থান দখল করে ও সেনাধ্যক্ষরা রাজনৈতিক নেতাদের বিকল্প হয়ে উঠে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার নিজ মন্ত্রিবর্গসহ সমগ্র দেশে একমাত্র নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেন। বস্তুত, তার শাসনামলে এমন এক নিরঙ্কুশ এককেন্দ্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয় যা উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনকেও হার মানায়।

নির্যাতন : আইয়ুব খান জনগণের ভোটাধিকার হরণ করার পর যারা এর বিরোধিতা করেছিল তাদের ওপর কঠোর দমন পীড়ন চালায়। শতাধিক মানুষকে হত্যা করে আইয়ুব খান। ভয়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে সে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। অবশেষে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু ছাত্র বিক্ষোভে তার মসনদ নড়ে যায়।

আইয়ুবের এক সময়ের সহযোগী ও মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কঠোর আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত পতন হয় আইয়ুবের এক দশকের শাসন।[3] বেশ প্রতাপের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও আজ আইয়ুব ইতিহাসে একজন ঘৃণিত ব্যক্তির নাম।

শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালে স্বৈরাচার শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতার দম্ভে পাগলপারা হয়ে বাংলাদেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। তার দুঃশাসনে এদেশের ইসলামপন্থীদের ওপর ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে। এটা অনুমিত ছিল। কারণ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানকে ভাঙতে দিতে চায়নি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম।

১৮ ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধ শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিশেষত কাদের সিদ্দিকীর অধীনে কাদেরিয়া বাহিনী ও জেনারেল ওবানের অধীনে মুজিব বাহিনী। ঢাকা ও তার আশপাশের মুসলিম লীগের নেতা কর্মী, নেজামে ইসলামের নেতা কর্মী, জামায়াতে ইসলামের নেতা-কর্মী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী, ন্যাপের নেতা-কর্মী, মসজিদ্‌গুলোর ইমাম মুয়াজ্জিন, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্রদের পল্টন ময়দানে

জমায়েত করা হতো। তারপর তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হতো। এটা কোনো গোপন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল খুবই প্রকাশ্য এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে চলে বেসামরিক নাগরিক হত্যা। এদের অপরাধ ছিল তারা পাকিস্তান ভেঙে যাক এটা চায়নি।[১]



একইসাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্ট দখলে নিয়ে সেখানের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সম্পদ লুটপাট করে। এটাও ছিল যুদ্ধাপরাধ। বিরোধী মতের রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ঘর দখল ও লুটপাটের আয়োজন করে মুক্তিবাহিনী। এ সবই ছিল যুদ্ধাপরাধ। যে মুহাজিররা ১৯৪৭ সালে ভারতের বিহার থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলায় এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিবাহিনীর অত্যাচারে আবার ভারতে পাড়ি জমান। এ এক জিল্লতির জীবন ছিল। বিহারিরা ফিরে যেতে পারলেও এদেশের ইসলামপন্থীদের পালানোর জায়গা ছিল না বললেই চলে। সে সময়ের বেশ কয়েকজন ভিকটিমের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা নির্যাতনের মুখে তাদের নিজ জেলা থেকে পালিয়ে দূরের জেলায় পালিয়ে থেকেছে।

ইসলামের প্রতি আক্রোশ : শুধু যে ইসলামপন্থীরা আক্রান্ত হয়েছে তা নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ইসলাম বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা ইসলামের প্রতি আক্রোশ দেখিয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নামে ইসলাম ও মুসলিম ছিল সেগুলো থেকে তারা ইসলাম ও মুসলিম শব্দ বাদ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম বাদ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো থেকে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' ও কুরআনের চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম বাদ দিয়েছে। পাবনার সেরা কলেজ ইসলামিয়া কলেজকে বুলবুল কলেজে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে সারা বাংলাদেশে সব স্থান ইসলাম ও মুসলিমকে উৎখাত করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বোরকা নিষিদ্ধ করে শাড়ি পরতে বাধ্য করা হয়েছে। এই কারণে বহু ছাত্রী একাত্তর পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে যায়নি।

সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২] এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, নেজামী ইসলামী ও জামায়াতে ইসলামী এই দুই দলই ছিল সে সময় ইসলামী রাজনীতির ধারক ও বাহক। এদের নিষিদ্ধ করা হয় নাই যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। বরং তাদের এই জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাজনীতি করেন।

সেসময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ন্যাপ (মুজাফফর), মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি এবং কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল এই দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের যারা কুশীলব তাদের মূল আক্রোশ ছিল ইসলামের সাথে। এই সাধারণ ব্যাপার সে সময়ের সকল ইসলামী রাজনীতিবিদ বুঝেছিলেন এবং তারা এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। সে সময়ের অনেক মুসলিম না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো এটা তাদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করুন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা রেডিও টেলিভিশনে বিসমিল্লাহ, সালাম দিয়ে শুরু করা বাদ দিয়ে সুপ্রভাত, শুভকামনা ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করেছে। রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী একাডেমি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ইসলামী একাডেমিকেই তিন বছর পরে ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে চালু করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আবার পুনরায় রেডিও টেলিভিশনে সালাম, বিসমিল্লাহ, আযান ও কুরআন তেলাওয়াত শুরু হয়েছিল।

মুজিবের শাসনামলের শুরুর দিকে সমস্ত ইসলামবিরোধী কাজের জোয়ার শুরু হয়েছিল। সংবিধান থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাদ পড়েছে। মূলনীতি থেকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস বাদ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কমিউনিজম, সেক্যুলারিজমের মতো ইসলাম ও ধর্মবিদ্বেষী মতবাদকে। ক্ষমতায় থেকে ইসলামপন্থা দমনে সব কাজ করেছেন শেখ মুজিব।

জাতীয়করণ : কমিউনিজমের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে একের পর এক শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেন মুজিব। তবে কোনো বাঙালির কারখানা জাতীয়করণের আওতায় আসে নি। ১৯৪৭ এর পর বাঙালি রাজনীতিবিদেরা সবসময় মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাতেন এদেশে ব্যবসা করার জন্য, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাতে সাড়া দেয় অনেক অবাঙালি কোম্পানি। এরা বেশির ভাগ ভারত ও মিয়ানমারের। এর মধ্যে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল আদমজি, বাওয়ানী ও ইস্পাহানি পরিবার। এর বাইরেও বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এদেশে এসেছিলেন।

বাংলা ও বাঙালির উন্নয়নে এসব উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেক অবদান ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব জাতীয়করণের নামে এসব অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সমস্ত সম্পদ ও কারখানা দখল করে নেয়। যারা এতদিন এদেশের নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের উন্নয়নে ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রেখেছিল শেখ মুজিব তাদের রিক্ত হস্তে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। তবে দুঃখজনক হলো, এসব শিল্প কারখানা থেকে বাংলাদেশ কখনোই লাভবান হতে পারেনি। সরকার বছর বছর কেবল এগুলোতে ভর্তুকি দিয়েই আসছে।[৩]

লুটপাট : যুদ্ধপরবর্তী মানুষের পুনর্বাসন একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মুজিব সরকারের জন্য। সেজন্য মুজিব জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশাল ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের লুটেরা গোষ্ঠীর লুটপাটে এই ত্রাণ থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের এতো ঊর্ধ্বগতি হয়েছিল যে, লবণের কেজি ৯০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। অথচ যুদ্ধের সময়ও ১ মণ চালের দাম ছিল ১৫-২০

লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন গুলি বুকে পেতে নিতে রাস্তায় নেমেছে তখন বাংলাদেশের কুখ্যাত স্বৈরাচার জনগণের ভয়ে পালিয়ে যায় ভারতে। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশত্যাগকারীদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা

টাকা। মুজিবের আমলে চালের কেজি ১০০-১৬০ টাকা, মশুর ডাল ১২০-১৫০ ও সয়াবিন ৫৯০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে। এর বড় কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধারা আমদানিকৃত দ্রব্য আটকে দাম বাড়াতো, একইসাথে এদেশীয় কৃষকের ক্ষেতের ফসলও তারা লুটপাট করে নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। ১৯৭০ সালে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' বলে মিথ্যা প্রচারণাকারীরা টের পেল সোনার বাংলা কিভাবে মুজিবের হাতে শ্মশান হয়![৪]

রক্ষীবাহিনী : মুজিব তার একান্ত অনুগত একটি বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এটা অনেকটা জার্মানির গেস্টাপো বাহিনীর মতো ছিল। সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাপরাধ করা কাদেরিয়া ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে মুজিব তার সমস্ত পরিকল্পনা মুহূর্তেই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। একইসাথে বিরোধী মত দমনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে রক্ষীবাহিনী। মূলত পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আদর্শের লোক থাকায় সেসব বাহিনীর ওপর মুজিব ভরসা করতে পারেননি। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুদদার ও কালোবাজারিদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এই বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গুম, গোলাগুলি, লুটপাট এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ঝটিকা বাহিনীর মতো রক্ষীবাহিনী প্রায়ই একেকটি গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং অস্ত্র ও দুষ্কৃতকারীদের খুঁজতো।[৫]

তাদের নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে লুটপাট এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগও ছিল। তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা যখন তুঙ্গে ওঠে এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তখন ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৭৩ জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে। রক্ষীবাহিনীর কোন সদস্য সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করলে অথবা সৎ উদ্দেশ্যে উক্ত কাজ করে থাকলে অনুরূপ কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া যাবে না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এই বাহিনীকে বিরুদ্ধ মত ও জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন শেখ মুজিব। রক্ষীবাহিনীর সাথে সরাসরি বিরোধ তৈরি হয় সেনাবাহিনীর সাথে। এই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি হতো।[৬]

লালবাহিনী : রক্ষীবাহিনী যেভাবে সরকারের ঘোষিত বাহিনী ছিল লালবাহিনী সেভাবে সরকারি বাহিনী ছিল না। আওয়ামী লীগের মধ্যে বামপন্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে ছিল। বামদের বড় অংশ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে। যখন আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা বামপন্থীরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে আলাদা হয়ে যায় তখন বাকিরা আওয়ামী শ্রমিক লীগ নাম ধারণ করে। যেহেতু জাসদের বড় অংশ ছিল শ্রমিক তাই শেখ মুজিব জাসদকে কন্ট্রোল করার জন্য শ্রমিক লীগকেই বেছে নিয়েছেন।

আবদুল মান্নান, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রধান ছিলেন, তার নেতৃত্বেই লালবাহিনী গঠন করা হয়। এটি ছিল একটি সশস্ত্রবাহিনী। এটিও সরকারের আজ্ঞাবহ তবে সরকার এর দায়দায়িত্ব নিত না। তাদের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করা। শ্রমিকদের মধ্যে জাসদের কার্যক্রম বন্ধ করাও ছিল লালবাহিনীর কাজ।

১৯৭২ সালের মার্চ থেকে অবাঙালিদের কারখানাগুলিকে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণার পরে লাল বাহিনী তাদের 'বিরোধী দল' হিসেবে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য শুদ্ধি অভিযান শুরু করে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে লাল বাহিনীর শুদ্ধি অভিযানের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তথাকথিত শোষণকারীদের শেষ করতে তাঁর 'লাল ঘোড়া' মোতায়েনের হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভাষণে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেওয়া হবে হুমকি দিতেন। লালবাহিনীর প্রধান আবদুল মান্নানকে এমনও বলতে শোনা গেছে যে, 'নতুন ফ্রন্ট (জাসদের শ্রমিক ফ্রন্ট) যদি মুজিববাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে তবে আমি তাদের জিহ্বা কেটে দেব।'[৭]

লালবাহিনীর গণহত্যা : লাল বাহিনীর প্রথম নৃশংসতা করেছিল মংলা বন্দরে। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কুলি হিসাবে কাজ করত। ধারণা করা হয়েছিল যে বামপন্থী শ্রমিক মোর্চা ও বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের মধ্যে কুলিদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব থেকেই এই গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসারে দাঙ্গার ফলে প্রায় ৩৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তবে প্রকৃত মৃত্যুর হার সরকার কর্তৃক বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দাঙ্গা চলাকালীন বাংলাদেশে থাকা বিশিষ্ট সাংবাদিক মাসকারেনহাসের মতে, সেদিন প্রায় ২০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং তারা সবাই বামপন্থী শ্রমিক ছিল। এই ঘটনা স্বাধীনতার কিছু দিন পর ১৯৭২ সালের মার্চে সংঘটিত হয়।

আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা ছিল ৫ এপ্রিল। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বাংলাদেশ

শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মীদের উপর লাল বাহিনীর লোকেরা হামলা করে। এই হামলার লক্ষ্য ছিল টঙ্গীর ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থিত ফেডারেশন কর্মীদের প্রভাব শেষ করা। ঐ সময় বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এটি বৃহত্তম ছিল। লাল বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় হাজার হাজার শ্রমিক নির্যাতিত ও সহিংসতার শিকার হয়। ন্যাপের দাবি অনুসারে সেখানে শতাধিক শ্রমিক খুন হন।

কালুরঘাট শিল্পাঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের আরআর জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলের দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী ছিল এই লালবাহিনী। এই দাঙ্গার পেছনের প্রধান কারণ ছিল 'স্থানীয় ও অ-স্থানীয় সমস্যা' এবং 'জেলাবাদ' যা লালবাহিনী সদস্যরা প্রবর্তন করেছিল এবং এটি শ্রমিকদের পার্থক্য করতে ব্যবহৃত হতো। চট্টগ্রাম যেহেতু একটি বন্দর নগরী ছিল তাই অন্যান্য জেলা থেকে কাজের সন্ধানে অনেক শ্রমিককে চট্টগ্রাম আসতে হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের মে মাসে লাল বাহিনী সদস্যরা স্থানীয়-অ-স্থানীয় সমস্যাটি ব্যবহার করে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছিল। যেভাবে আগে তারা বামপন্থী ইস্যুতে শুদ্ধি অভিযান করেছিল। এই হামলায় চট্টগ্রামে কাজ করতে আসা শত শত শ্রমিককে খুন করে লালবাহিনী। আরো বেশ কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল এবং খুনোখুনি ছিল নিয়মিত ঘটনা। এতে মিলগুলির উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছিল। লালবাহিনীর দৌরাত্ম্যে কারখানাগুলো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়েছিল। কারখানাগুলোর শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলো। লালবাহিনীর অশিক্ষিত শ্রমিকরাই তাদের ইচ্ছেমতো কারখানা পরিচালনা করতে লাগলো। এরপর সরকার একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি।[৮]

ভারতের আজ্ঞাবহ : শেখ মুজিব সরকার ভারতের আজ্ঞাবহ সরকারে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতো না। পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিটা সিদ্ধান্তের জন্য ভারতের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে মুজিবকে। শেখ মুজিব তার ক্ষমতার শেষদিকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। তদুপরি সে যখন দেখলো সে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে, দুর্ভিক্ষ ছাড়ছেই না। জনগণ বেকার হয়ে পড়েছে।

বাকশাল : শেখ মুজিব তার ক্ষমতার একেবারে শেষদিকে এসে মাও সে তুং-এর মতো করে একদলীয় শাসন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে শুধু একটি দল থাকবে তার নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুসারে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমগ্র রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামক এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। বাকশাল ব্যবস্থায় দলের চেয়ারম্যানই সর্বক্ষমতার অধিকারী। চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন এবং একমাত্র চেয়ারম্যানই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করতে পারবেন।

বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে কোন নির্দলীয় শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক সংগঠন এবং গণসংগঠন করার কোন অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়ন মাত্রই তাকে বাকশালের অঙ্গদল শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই ব্যবস্থায় জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুবলীগ এবং জাতীয় ছাত্রলীগ বাদে কোন শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব ও ছাত্রসংগঠন থাকতে পারবে না। আর উপরিউক্ত সংগঠনগুলো হচ্ছে বাকশালেরই অঙ্গ সংগঠন। বাকশাল আইনের অধীনে ১৯৭৫ সালের ৬ জুন দেশে চারটি দৈনিক ছাড়া আর সকল সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। ঐ চারটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার।[৯]

অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাদের একটি ছোট দল ক্যু করে হত্যা করে শেখ মুজিবকে। বাংলার ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনায় দেশের মানুষ উল্লাস প্রকাশ করে। দলে দলে মানুষ সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে আসে। সেনাসদস্যদের কাঁধে তুলে নাচতে থাকে মানুষ। কথিত আছে যে, মিষ্টির সঙ্কট পড়ে যায় সারাদেশে।

লে. জে. হুসেইন মু. এরশাদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকজন কুখ্যাত স্বৈরশাসক হলো হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার প্রেক্ষাপটে অবৈধভাবে বিচারপতি সাত্তারকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করে এরশাদ। বরাবরের মতোই মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে এরশাদ।



ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সবরকমের অপকর্ম করেছিল এরশাদ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখেছে। ১৯৮৪ সালে এরশাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে জামায়াতের তৎকালীন আমীর শহীদ অধ্যাপক গোলাম আযম কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন।[১০]

এরশাদের গণহত্যা ও নানাবিধ ছলনার শিকার হয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ অবশেষে জামায়াত প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা মেনে নেয়। এরশাদের অধীনে নয়, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সকল রাজনৈতিক দল আন্দোলন শুরু করে। জনগণের বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পতন হয় এরশাদের।[১১]

আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরশাদ একটি ঘৃণিত নাম। এরশাদের বাকি রাজনৈতিক জীবনও স্বচ্ছ ছিল না। দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বৈরাচার হাসিনার দোসর হিসেবে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছে এরশাদ। সকালে এককথা বিকেলে আরেক কথা বলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় 'বেঈমান' হিসেবে কুখ্যাতি কুড়িয়েছে এরশাদ।

শেখ হাসিনা



বাংলাদেশে সবচেয়ে নিষ্ঠুর স্বৈরাচারের পতন হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। ১৬ বছর ধরে জোর করে ক্ষমতায় থাকা দাম্ভিক হাসিনা ছাত্রদের একটি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া গণ-অভ্যুত্থানে পালিয়ে যায় দেশ থেকে। এরকম নজির আধুনিক বাংলায় নেই। বহু আগে মধ্যযুগে অর্থাৎ ১২০৫ সালে বাংলার আরেক অত্যাচারী শাসক লক্ষণ সেন এভাবে পালিয়ে যায় মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ভয়ে।

২০০৮ সালে ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জির তত্ত্বাবধানে একটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা।[১২] ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কথিত বিডিআর বিদ্রোহের নামে ভারতীয় ভাড়াটে খুনি এনে দেশপ্রেমিক ৫৭ সেনা অফিসারকে খুন করে শেখ হাসিনা।

এরপর এদেশের ইসলামী রাজনীতিকে বন্ধ করে দেওয়ার নিমিত্তে ভারতের পরামর্শে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় চাপিয়ে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের জুডিশিয়াল কিলিং-এর মাধ্যমে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সারাদেশে শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে। শত শত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে গুম করে। সারাদেশে এক লাখেরও বেশি মিথ্যা মামলায় আটক করে ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে।[১৩]

২০১৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রিয় নেতা শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ দেয়। সারাদেশের মানুষ বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভ দমনে শেখ হাসিনা খুন করে প্রায় দুই শতাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে।

২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে নবী সা. অবমাননাকারীদের বিচারের দাবিতে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশ করে হেফাজতে ইসলাম। সেই সমাবেশে ভয়ঙ্কর ম্যাসাকার চালায় শেখ হাসিনা। এক রাতে খুন করে শতাধিক মাদ্রাসা ছাত্রকে। যা শাপলা ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত।

সারাদেশে ছাত্রলীগ যুবলীগ দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে শেখ হাসিনা। সিন্ডিকেট ও লুটপাটের মাধ্যমে দেশের সম্পদ সব বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে হাসিনা ও তার অনুসারী গুণ্ডারা। দেশের মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা তিন তিনটি একপেশে নির্বাচন করেছে। বিরোধী প্রার্থীদের গুম খুন ও কারাগারে পুরে রেখেছে। জনগণকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। নিজের ইচ্ছেমতো জনগণকে শোষণ করেছে হাসিনা। ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করেছে ৩ হাজারেরও বেশি বিরোধী নেতাকর্মীকে। হয় হাসিনার তোষামোদি করতে হবে নতুবা মরতে হবে- এই নীতিতে দেশ চালিয়ে আসছিল। সরকারি চাকরি পাওয়ার অধিকারও হারিয়ে ফেলেছে জনগণ। বিভিন্ন কোটার মাধ্যমে ৫৬% কোটা সংরক্ষিত রেখেছে। এর মধ্যে ৩০% ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা।[১৪] আর এই কোটার মাধ্যমে হাসিনা তার নিজস্ব লোকদের চাকরি দিত।

ছাত্ররা কোটার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। শেখ হাসিনা এই আন্দোলন দমাতে নিরস্ত্র ছাত্রদের খুন করা শুরু করেছে। অবশেষে ছাত্রআন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছে। শেখ হাসিনা খুন করেছে প্রায় ৮ শতাধিক মানুষকে। গুলিতে আহত হয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে রাজধানী ঢাকার বাড়িতে বাড়িতে গুলির চিহ্ন। ঘরের ভেতরে থাকা মানুষরাও গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে। ছাদে খেলতে থাকা বাচ্চাশিশুও শেখ হাসিনার গুলি থেকে রেহাই পায় নি।[১০]

অবশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন গুলি বুকে পেতে নিতে রাস্তায় নেমেছে তখন বাংলাদেশের কুখ্যাত স্বৈরাচার জনগণের ভয়ে পালিয়ে যায় ভারতে। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশত্যাগকারীদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা।

মানুষজন ঈদের মতো কোলাকুলি করে উদযাপন করে স্বৈরাচারের ঐ পতন। হাসিনার পতনের খবরে ঢাকার সব মিষ্টির দোকান খালি হয়ে যায়। রাস্তায় নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শুধু পুরুষরা নয়, নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা রাস্তায় নেমে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। অনেকেই রাস্তায় রাস্তায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া প্রকাশের নিমিত্তে সিজদা দিতে থাকে। বাঙালির জীবনে এমন খুশির দিন আর আসেনি।

তথ্যসূত্র:

১. *আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ; ১০২*
২. *রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ কে এম নাজির আহমদ / দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ; ১৮*
৩. *বঙ্গকথা / আহমেদ আফগানী / ইকরি বিকরি প্রকাশনী / পৃ; ৪১৮ -৪২২*
৪. *বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ ৩১৫-৩১৭*
৫. *ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ / ইকতেদার আহমেদ / দৈনিক নয়া দিগন্ত / ২৮ ডিসেম্বর ২০২০*
৬. *'পাটশিল্পসহ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত রক্ষা গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার'/ দ্য ডেইলি স্টার / ২৪ জানুয়ারি ২০২১।*
৭. *Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman / Moudud Ahmed / UPL / p 201- 202*
৮. *বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ ১৮৫-১৮৮*
৯. *দেয়াল / হুমায়ুন আহমেদ / পৃ: ৯৪ ও ১০৭*
১০. *বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ: ১৮৮- ১৮৯*
১১. *এরশাদের পতন: পর্দার আড়ালে যা ঘটেছিল / বিবিসি বাংলা / ৬ ডিসেম্বর ২০১৭*
১২. *রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ কে এম নাজির আহমদ / দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ: ১২০-১২১*
১৩. *Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman / Moudud Ahmed / UPL / p. 147-149*
১৪. *বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ: বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ: ১৮৯- ১৯০*

লেখক : কলামিস্ট ও ব্লগার



বাইয়াত নিয়ে বিভ্রান্তি

রেদওয়ান রাওয়াহা

লেখাটির পেছনের গল্প

বাইয়াত ও জামায়াত নিয়ে আমার একটা লেখা গত বছর মাসিক ছাত্র সংবাদের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখাটির উদ্দেশ্য ছিল বাইয়াত ও জামায়াত (সংগঠন) নিয়ে বিভ্রান্তির সমাধান হাজির করা এবং বিষয়গুলো স্পষ্ট করা। আলহামদুলিল্লাহ, আমার লেখাটি বেশ সমাদৃতও হয়। তবে আমার কাছে মনে হলো সে লেখায় জামায়াত বিষয় কাভার করতে পারলেও বাইয়াতটা সেভাবে হয়নি। যাইহোক, সে লেখাটি পড়ে তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহতারাম মঞ্জুরুল ইসলাম ভাই আমাকে কল দেন এবং বাইয়াত নিয়ে আরেকটু সুন্দর করে গুছিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে ও নোট দিতে বলেন।

তখন সবিস্তারে লিখতে না পারলেও ভাইকে খুবই অল্প সময়ে অনেক ছোটো একটা নোট দিই। এরপর এ বছরের ১৩ অক্টোবর Centre for Islamic Thoughts and works (CITW)-এর সুপ্রিয় তরুণ ভাইয়েরা বাইয়াত ও জামায়াতের ওপর একটা সেশন আয়োজন করে। আর উক্ত সেশনটা আমাকেই নিতে হয়। সে উপলক্ষ্যে আগে-পরে যা পড়েছি ও পড়ে নোট করেছি, সেগুলোই পরিপূর্ণভাবে ছাত্র সংবাদের পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম। আশা করি আগের লেখার সাথে মিলিয়ে পড়লে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

বাইয়াত কি শুধু খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতেই হতে হবে?

বাইয়াত নিয়ে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো হাদিসই আছে। যেগুলো বিশুদ্ধতায় মানোত্তীর্ণ। মূলত ইসলামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিলেন, সমাজ-রাষ্ট্রের সব ব্যবস্থাতেই দ্বীনকে যখন বিজয়ী করে দিলেন, খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলো, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র তৈরি হলো, তখন সব মুসলিমের জন্য আবশ্যক হয়ে গেলো রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার হাতে বাইয়াত নেওয়া। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকাবস্থায় খলিফার হাতেই বাইয়াত নিতে হবে। এটাই হচ্ছে শুদ্ধ কথা। এমনকি মুসলমানদের একজন আমীর বা খলিফা থাকাবস্থায় অন্য কেউ বাইয়াতের দাবি করলে তাকে কতল (হত্যা) করার নির্দেশও হাদিস থেকে পাওয়া যায়। যেমন সহিহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে, যেখান বলা হয়েছে– "যদি দুজন খলিফার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে।" (সহিহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৪৬৪৬)

এছাড়াও অন্য আরেকটি হাদিসে আছে, এরকমই। মানে মুসলমানদের জন্য একজন আমীর বা খলিফা থাকার পরেও কেউ যদি এসে তাঁর সাথে ক্ষমতার লোভে ক্ষমতা লাভের জন্য ঝগড়ায়

লিপ্ত হয়, তবে রাসূলের (সা) নির্দেশ হচ্ছে পরবর্তী জনের গর্দান তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। (মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৪৬২৪)। এভাবে আরো কিছু হাদিস আছে।

এই যে খলিফার হাতে বাইয়াত নেওয়ার বিষয়টি, তা যে সকল মুসলিমের জন্যই ফরজ, এটুকু নিয়ে দ্বিমত নেই। বাকি কথাটা হচ্ছে যখন খিলাফত থাকবে না, তখন কি বাইয়াত নেই? একটা গোষ্ঠীর বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণায় আন্দোলনমুখী ও মধ্যপন্থী অনেক আলিমগণও মতামত দেওয়া শুরু করেছে যে, খিলাফত ও খলিফা ছাড়া ইসলামে কোনো বাইয়াত নেই। কিন্তু বিষয়টা কি আসলেই তাই? চলুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগিতে ঘুরে আসি।

আল্লাহর রাসূল (সা) যখন দ্বীন নিয়ে মানুষের কাছে আসলেন। তখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহর কাছে মানুষ কিসের ওপর বাইয়াত নিতেন? অনেকগুলো বিষয়ের ওপরই বাইয়াত নিতেন। একেক জনকে বা একেক গ্রুপকে একেকটা বিষয় নিয়ে নবী (সা) বাইয়াত দিতেন। কখনো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার বাইয়াত, কখনো পিতা-মাতার আনুগত্য আর খিদমত করার বাইয়াত। কখনো ব্যভিচার না করার বাইয়াত। শিরক না করার, অন্য মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনার, কখনো কখনো দীনি ভাইয়ের রক্তের বদলা নেবার বাইয়াত এবং জিহাদের বাইয়াত ইত্যাদি। তবে সব বাইয়াতের মূল ভাব হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের অনুসরণ। নিজের নফসের গোলামি ও তাগুতকে বর্জন। (বিস্তারিত দেখুন, হায়াতুস সাহাবা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৯-৪২৩)

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইয়াত

এবার আমরা মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সময়ের দিকে খেয়াল করি। দেখুন, বাইয়াতে আকাবা তথা আকাবার শপথ কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইয়াত ছিল না। তখন তো মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফতই কায়েম হয়নি। তবুও তারা দুই-তিন ধাপে বাইয়াত নিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দিয়েছেন। এখন কথা হলো তখন যেহেতু ইসলামী খিলাফাহ কায়েমই হয়নি, তাহলে তাঁরা দুই-তিন ধাপে কিসের ভিত্তিতে বাইয়াত নিয়েছেন? যদি রাষ্ট্র ছাড়া বাইয়াত না-ই থাকে, তাহলে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন বাইয়াত দিলেন?

আসহাবে রাসূলও-বা কেন নিলেন? চলুন, আমরা এখন একটু দেখে আসি বাইয়াতে আকাবায় কী কী বিষয়ের ওপর আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত নিয়েছেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও-বা কী কী বিষয়ের ওপর বাইয়াত দিয়েছেন।

বাইয়াতে আকাবা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে মিনার 'আকাবায়' মদিনার খাযরাজ গোত্রের ছয়জন লোকের সাথে মিলিত হলেন। আমরা আগের লেখাতেও উল্লেখ করেছি যে, মদিনা তথা ইয়াসরিবে তখন আউস এবং খাজরাজ এই দুই আরব গোত্রের মধ্যে প্রায়শই লড়াই লেগেই থাকত। বছরের পর বছর অব্যাহত লড়াইয়ে তারা সব হারিয়ে একদিকে নিঃশেষ হয়ে গেছে অন্যদিকে অবসাদও হয়ে পড়েছিল। তারা এই বোঝা আর বহন করতে চাচ্ছিল না। অবসাদ থেকে তারা একটুখানি অবসর চাচ্ছিল। ফলশ্রুতিতে নিজেদের মধ্যকার এই লড়াই সমাপ্ত করতে একজন সর্বজন মান্য নেতা ও মধ্যস্থতাকারী খুঁজছিল।

মদিনায় তখন আউস এবং খাযরাজ গোত্র ছাড়াও কিছু ইহুদি গোত্র বসবাস করত। গোত্রগুলো হলো যথাক্রমে বনু কুরাইজা, বনু কায়নুকা ও বনু নাজির। মূলত এই ইহুদিরাই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত উসকে দিত। যেটা ওই প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছি। যাই হোক, ইয়াহুদিরা যেহেতু আসমানি কিতাবধারী, তাই তাদের কাছ থেকেই আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সবসময়ই একজন শেষ নবীর আগমনের কথা শুনতে পেত। এর মধ্যে তারা মক্কায় রাসূল (সা)-এর নবুওয়াতের কথা শুনতে পেল। তখন তারা নবুওয়তের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে মদিনায় এলে রাসূল (সা) মিনার 'আকাবায়' তাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। রাসূল (সা)-এর সাথে তাদের বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাদেরকে ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। নবী করিম (সা) এর দাওয়াত শোনার পর তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, "তোমরা নিশ্চিত জেনে রেখো, এই ব্যক্তিই সেই নবী, যার কথা ইহুদিরা তোমাদের কাছে বলে আসছে। এখন ইহুদিরা যেন আমাদের আগে এই নবীর সহযোগী হয়ে যেতে না পারে।" (বই: মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম, পৃষ্ঠা-১৯০)

এরপর তারা বলতে থাকে, "আমরা আমাদের জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমাদের মধ্যে যত শত্রুতা ও কলহ-বিবাদ ও কোন্দল বিদ্যমান রয়েছে, তা বোধ হয় আর কোনো জাতিতে নেই। হতে পারে রাসূলের (সা) মাধ্যমে আমাদের জাতিকে আল্লাহ আবার ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সা)-এর দ্বীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দেবো এবং আমরা তাঁর সামনে এই দ্বীনের ব্যাপারে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, তাদের সামনেও সেই মনোভাব ব্যক্ত করব। তারপর আল্লাহ যদি তাদেরকে এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত করে দেন, তাহলে এরপর থেকে ইনিই হবেন সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি।"

আল্লাহর রাসূলের সাথে বৈঠক করে ইসলামের ব্যাপারে কনভিন্স হওয়া সেই ছয়জন হচ্ছেন আসাদ বিন যরারা, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আওফ বিন হারিছ, রাফে বিন মালিক, কুতবা বিন আমের এবং উকবা বিন আমের। এই ছয়জন আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত কবুল করে মদিনায় ফেরত গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মদিনার ঘরে ঘরে শাশ্বত দ্বীনের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল। পরের বছর মদিনা থেকে ১২ জন লোক আসলো। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) ব্যতীত আগের বছরের সকলেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের কাছে যেসব বিষয়ের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেন, সেগুলো হচ্ছে:

১. আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না।

২. এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করব না।
৩. চুরি করব না।
৪. যিনা করব না।
৫. সন্তান হত্যা করব না।
৬. জেনে-বুঝে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাব না। (বই : মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা-১৯১; সহিহ বুখারি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৬৭২০)

এর পরের বছর মদিনা থেকে বারা বিন মারুর নেতৃত্বে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী মক্কায় আগমন করলেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে রাসূল (সা)-এর সাথে গোপনে মিলিত হলেন। তাঁরা তখন ইসলাম গ্রহণ করার সময় রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা কিসের ওপর আপনার কাছে বাইয়াত নেব? তখন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন–

১. খুশিতে-অখুশিতে আমার কথা শুনবে ও মানবে,
২. সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে,
৩. সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে,
৪. আল্লাহর হক আদায় করবে, এ ব্যাপারে কোনো সমালোচকের সমালোচনায় ও নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না,
৫. আমি তোমাদের কাছে এলে (মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলে) তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা যেভাবে নিজেদেরকে, নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হেফাজত করো, সেভাবেই তোমরা আমাকে হেফাজত করবে। (বই: হায়াতুস সাহাবা, পৃষ্ঠা-৪১২-১৩)

বাইয়াতে আকাবা আমাদের কী শেখায়?

দেখুন, এই যে বাইয়াতে আকাবা, এটি যখন সংঘটিত হয়, তখন কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না। ইসলাম তখনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখন ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী খিলাফত নামে কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। তবুও তারা বাইয়াত নিয়েছেন। রাসূল (সা)-ও বাইয়াত দিয়েছেন। তো এই বাইয়াত দেওয়া ও নেওয়া কিসের ওপর ভিত্তি করে হয়েছিল, তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তবুও আমরা যদি সোজা ভাষায় বলি, সেটা হচ্ছে তারা বাইয়াত নিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনকে তার জমিনে (ইয়াসরিবে) গালিব করার জন্য এবং এই কাজের জন্য একজন নেতার প্রয়োজন। সংগঠিত হবার প্রয়োজন। প্রয়োজন দাওয়াত ও তালিম-তরবিয়তের। তারা সেজন্য সবগুলোই করেছেন। আর নেতা হিসেবে রাসূল (সা)-কে মেনে নিয়েছেন। তাঁর হাতে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রচারের জন্য, পালনের জন্য এবং সর্বোপরি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার জন্য বাইয়াতবদ্ধ হয়েছেন। এমনকি রাসূলের হাতে বাইয়াত হবার পরে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা মদিনার ইয়াহুদিদের সাথে সকল চুক্তিও পরিত্যাগ করেছিল। যাইহোক, এখন যারা বলে রাষ্ট্র ছাড়া বাইয়াত নেই, তারা এক্ষেত্রে কী জবাব দেবেন? মূলত রাষ্ট্র/ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের ওপর সংগঠিত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বাইয়াতবদ্ধ হওয়া ফরজ। তারপর বাইয়াতবদ্ধ হয়ে সংগঠিতভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে থেকে এর মাধ্যমেই ইসলামী হুকুমত বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে। যখন ইসলামী খিলাফাহ বা ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, তখন তারপরই তো আসবে খলিফার নিকট খিলাফতের বাইয়াতের কথা। এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা।

দ্বীন কায়েমের কাফেলাগুলো কী করে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে আজমাইনের সিরাত ও বাইয়াতে আকাবার শিক্ষা যেহেতু ইসলামের ওপর বাইয়াতবদ্ধ হয়ে সংগঠিতভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে থেকে এর মাধ্যমেই ইসলামী হুকুমত বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ করা বা ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য ময়দান প্রস্তুত করা, সেহেতু দ্বীন কায়েমের জন্য নিবেদিত কাফেলাগুলো এই শিক্ষাটিরই বাস্তবায়ন করে। তারা ইসলামী হুকুমত কায়েমের স্বপ্ন নিয়েই, ইসলামকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্যই বাইয়াতবদ্ধ হয়। চলুন, আমরা ঘুরে আসি ছাত্রশিবিরের সদস্যদের বাইয়াত থেকে।

ছাত্রশিবিরের সদস্যরা বাইয়াত নেয় সর্বপ্রথম কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে। মানে আল্লাহকে রব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করে তারপরই তারা সাতটি বিষয়ে শপথ গ্রহণ করে। সেই বিষয়গুলো হুবহু শিবিরের সংবিধান থেকেই তুলে ধরছি:

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন গঠন করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হবে আমার জীবনের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য হচ্ছি।
২. আমি শিবিরের কর্মনীতি ও কর্মসূচি পুরোপুরি সমর্থন করি।
৩. আমি এ সংবিধান অনুযায়ী শিবিরের নিয়ম-কানুন পালন করব। আমি আরও ওয়াদা করছি যে, আমার সাধ্যানুযায়ী-
৪. আমি সমস্ত ব্যাপারে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা এবং কার্যক্রমকে কুরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে গঠন করার চেষ্টা করব এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য, পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি ও আনুগত্যের কেন্দ্র পরিবর্তন করে শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের অনুকূলে গড়ে তোলার চেষ্টা করব।
৫. আমি জ্ঞান অর্জন করতে এবং শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার বিকাশ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাব।
৬. আমি ছাত্রদের নিকট শিবিরের আহবান পৌঁছাতে এবং যারা তা গ্রহণ করে তাদেরকে শিবিরের পতাকা তলে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করব।
৭. আমি আমার ওপর অর্পিত আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করব। 'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়ামাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।'

নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। (বই : সংবিধান, অধ্যায়-পরিশিষ্ট)

এবার আসুন বৃহত্তর আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর বাইয়াতে।

তাদের গঠনতন্ত্র থেকেই তুলে ধরছি বিষয়টা। জামায়াতে ইসলামী যেসব বিষয়ের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করে, সেগুলো হলো:

"আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সাক্ষী রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত ওয়াদা করিতেছি যে, দুনিয়ায় সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য আমি খালিসভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হইতেছি। আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র বুঝিয়া লওয়ার পর আরো ওয়াদা করিতেছি যে,

১. আমি এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে মানিয়া চলিব;
২. সর্বদাই শরিয়াতনির্ধারিত ফরজ-ওয়াজিবসমূহ রীতিমত আদায় করিবো এবং কবিরা গুনাহসমূহ হইতে বিরত থাকিব;
৩. আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির পর্যায়ে পড়ে উপার্জনের এমন কোনো উপায় গ্রহণ করিব না
৪. এমন কোনো পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক রাখিব না, যাহার মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের ঈমান ও আকিদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী।

নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সর্বপ্রকার ইবাদাত অনুষ্ঠানসমূহ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আল-আনআম-১৬২) আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই ওয়াদা পালনের তাওফিক দান করুন। আমিন। (গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

এই হলো জামায়াতে ইসলামীর বাইয়াত। এখন দেখুন, এই যে বাইয়াতটা, এই বাইয়াতের সাথে বাইয়াতে আকাবার কোন বিষয়টি বা কোন চেতনাটি সাংঘর্ষিক? বরং দেখা যায়, কোনো সাংঘর্ষিক বিষয়-আশয় তো নেই-ই, বরং তারা সে সকল বিষয়ের ওপরই আজকের এই যুগে এসেও বাইয়াতবদ্ধ জীবন যাপন করে আদর্শ মুসলিম হিসেবে নিজেকে এবং সমাজের অগণিত তরুণ ছাত্রকে তৈরি হবার সুযোগ করে দিচ্ছে। ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতে নিজেদেরকে এবং মুসলিমদেরকে তৈরির কার্য সম্পাদনা করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হবার পরের বাইয়াত

আচ্ছা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাষ্ট্রপ্রধান হলেন, মদিনায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করলেন, এরপরে কি সব বাইয়াতই কেবল খিলাফতের বা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের বাইয়াতই ছিল? সব বাইয়াতই কি সবসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিতেন?

এর উত্তর হলো, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর ইসলামী হুকুমতের প্রধান হবার পরেও সব সময় কেবলই রাষ্ট্রের আনুগত্যের বা ইসলামী হুকুমতের বা ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্যের বাইয়াতই দিতেন না এবং সব সময় সব জায়গায় নিজেও যেতে পারতেন না। কখনো কখনো প্রতিনিধিও পাঠাতেন। এই ব্যাপারে এখন আপনাদের মধ্যে দলিলপত্র পাবার অদম্য এক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই। ঠিক না? তাহলে আপনাদের জন্য এক্ষুনি দলিল উপস্থাপন করছি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা মুমতাহিনার বারো নাম্বার আয়াতটি পড়ে দেখুন। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন–

"হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাইয়াত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

এই যে আয়াতটি, এই আয়াতটি খেয়াল করে দেখুন, এখানে মুমিন নারীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর মূলত এই আয়াত মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয়েছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদেরকে বাইয়াত দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মক্কা বিজিত হলে কুরাইশরা বাইয়াতের জন্য দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাজির হতে থাকল। তিনি তখন নিজে সাফা পাহাড়ের ওপর পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করতে এবং এ আয়াতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে বাইয়াত নিতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে গিয়ে আনসারী মহিলাদের এক জায়গায় জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য এবারও সাইয়্যেদুনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন।

এছাড়াও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে পুরুষদের সমাবেশে বক্তৃতা করার পর মহিলাদের সমাবেশে গিয়ে সেখানেও বক্তৃতার মধ্যে উপরিউক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর মধ্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেসব বিষয়েই তিনি মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন। (তাফহিমুল কুরআন, সূরা মুমতাহিনা, টীকা : ১৮)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে আহসানুল বায়ান প্রণেতা বলেন, বাইয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও নিতেন যে, তারা শোকে রোদন করবে না, বুকের কাপড় ছিঁড়ে মাতম করবে না। মাথার চুল ছিঁড়াছিঁড়ি করবে না এবং জাহেলি যুগের মহিলাদের মতো ডাক পাড়বে না (বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি)। এই বাইয়াতে সালাত, সিয়াম, হজ ও জাকাত ইত্যাদির কথা উল্লেখ নেই। কারণ, এগুলো ইসলামের রুকন এবং দ্বীনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আচার বিধায় তার বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। তিনি বিশেষ করে সেই জিনিসগুলোর বাইয়াত

নিয়েছেন, সাধারণত যেগুলো মহিলাদের দ্বারা বেশি হয়ে থাকে। যাতে তারা দ্বীনের রুকনগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার সাথে সাথে এই জিনিসগুলো থেকেও বিরত থাকে। (তাফসিরে আহসানুল বায়ান, সূরা মুমতাহিনা : ১২)

আমাদের প্রিয় নবী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কোন কোন বিষয়ে বাইয়াত দিতেন, সে বিষয়েও আমরা দুয়েকটা হাদিস উল্লেখ করতে চাই। যেমন– আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটা হাদিস আছে, যেখানে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের বাইয়াত করার সময়ে এই বিষয়েও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তারা মৃতের জন্য বিলাপ করবে না। তখন তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মহিলারা জাহিলি যুগে মৃতের জন্য বিলাপে আমাদের সহযোগিতা করত। এখন আমরা কি মৃতের জন্য বিলাপে তাদের সহযোগিতা করব না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইসলামে মৃতের জন্য বিলাপে কোনো সহযোগিতা নেই। (সুনানে নাসাঈ: ১৮৫৫)

জারির ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, জাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার। এছাড়াও শিরক পরিত্যাগ করার বাইয়াতও নিয়েছেন তিনি (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান : ৫৭, হায়াতুস সাহাবা, পৃষ্ঠা: ৪০২-৩)। এই পর্যায়ে এখানে খেয়াল করে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সব সময়ই বাইয়াত গ্রহণ করতে পারতেন না, ফলে কখনো কখনো প্রতিনিধি পাঠাতেন। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, এখানে কিন্তু খলিফা ও খিলাফত, রাষ্ট্র ও সরকারের যেই আনুগত্যের বাইয়াত, সেটাও ছিল না। তবে অনেক বাইয়াতে সেটাও ছিল। মানে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের বাইয়াতও ছিল। যেমন এই হাদিসটি লক্ষ্য করুন, "উবাদা ইবনু সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তার আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর পথে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দার পরোয়া করব না। (সহিহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭০৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) রাষ্ট্রীয় বাইয়াত ছাড়াও যে বাইয়াতগুলো দিতেন, বিশেষত আমাদের উপরোউক্ত আলোচ্য অংশটাতে সেগুলো হচ্ছে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহর একত্ববাদ, মুসলিম ভাইবোনদের জন্য কল্যাণ কামনা, অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার না করার প্রতিশ্রুতি, দ্বীনের বিধান বা কুরআন হাদিস শোনা এবং মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বাইয়াত ইত্যাদি ছিল। এমনকি মহিলা সাহাবীদের বাইয়াতবদ্ধ হবার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে।

মহিলাদের বাইয়াত

ওপরের পয়েন্টে বাইয়াতের আয়াত এবং হাদিসে মহিলা সাহাবীদের বাইয়াত গ্রহণের বিষয়টা সুস্পষ্ট ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহিলা সাহাবীদেরও বাইয়াত প্রদান করতেন, বিষয়টি তো দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই বাইয়াতে কি মহিলা সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের হাতের ওপর হাত রাখতেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নারী সাহাবীদের হাত ধরে বা স্পর্শ করে বাইয়াত দিতেন? চলুন, বিষয়টি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে জেনে আসি। তিনি বলেন, "মহিলাদের বাইয়াত কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হতো। হাতের ওপর হাত রেখে না, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো। যেসব মুমিন মহিলা বাইয়াতের শর্তগুলো মেনে নিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন, আমি কথার মাধ্যমে তোমাকে বাইয়াত করে নিলাম। আল্লাহর কসম! বাইয়াত কালে কোনো নারীর হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতকে স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি শুধু এ কথার দ্বারাই বাইয়াত করতেন, 'আমি তোমাকে এ কথার ওপর বাইয়াত করলাম।' বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত কখনোই কোনো গায়রে মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি" (বুখারি: ৪৮৯১, মুসলিম: ১৮৬৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়গুলোর ওপর বাইয়াত প্রদান করতেন

আমরা যদি রাসূলের (সা) বাইয়াতের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখবো যে, তাঁর বাইয়াত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

১. ঈমানী বাইয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করার বাইয়াত।

২. কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলার বা নানান বিষয়ভিত্তিক আমলের বাইয়াত।

৩. ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দান প্রস্তুত করার বাইয়াত।

৪. রাষ্ট্রপ্রধান বা খিলাফতের বাইয়াত।

৫. জিহাদের বাইয়াত।

৬. ঈমানদারদের মধ্য থেকে শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার দূর করার বাইয়াত।

৭. মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করার বাইয়াত।

৮. দ্বীনের পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া না করে পূর্ণোদ্যমে সম্মুখপানে এগিয়ে চলার বাইয়াত। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের বাইয়াতও নিয়েছেন সাহাবায়ে আজমাইনের কাছ থেকে।

আর মূলত ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তিরা কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলার বাইয়াত এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দান প্রস্তুত করার বাইয়াতই গ্রহণ করে। এরপর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হলে তখনই রাষ্ট্রপ্রধান বা খিলাফতের বাইয়াতের বিষয় আসবে। ইকামাতে দ্বীনের কর্মীদেরকে তাদের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সেই বাইয়াত তথা খিলাফতের বাইয়াত দিচ্ছে না। সুতরাং এটা নিয়ে বিভ্রান্তি কাম্য নয়। তাছাড়া এই বাইয়াতের সিলসিলাও

বাংলাদেশের প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনগুলোর চালু করা নয়। বরং আধুনিক দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনগুলো প্রতিষ্ঠার শতাব্দীকাল পূর্বেও এই বাইয়াত দেওয়া-নেওয়া হতো। এর বহুকাল পূর্ব থেকে তো পীর-মুরিদী বাইয়াত চলছিলই। যদিও ইসলামের প্রথম ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জিহাদ ও খিলাফতের বাইয়াত ছাড়া আর কোনো বাইয়াত (সাংগঠনিক বা পীর মুরিদী) ছিল না। আর থাকবেই-বা কেন? তখন রাষ্ট্র ইসলামকে পেট্রোনাইজ করত। দ্বীনের বিধি-বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম ছিল। শাসক খারাপ হলেও দ্বীনকে ইগনোর করত না। এই যখন অবস্থা, তখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন প্রতিষ্ঠারও ওই অর্থে প্রয়োজন ছিল না। কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্যে পীর-উস্তাদের বাইয়াতও প্রয়োজন হতো না।

উপমহাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও বাইয়াত

সারাবিশ্বে তখন ইউরোপীয়দের উত্থান চলছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের খিলাফত ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটছিল। তবুও নামকাওয়াস্তে হলেও ১৯২৪ সাল অবধি মুসলমানদের একটি খিলাফাহ ছিল। যা কামাল পাশা ধ্বংস করে সেটার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র চালু করে। সে যাই হোক, উসমানি খিলাফাহ থাকাবস্থাতেই এই উপমহাদেশে ইংরেজ দস্যুরা আগমন করে। মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করে। এরও পূর্ব থেকে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা থাকার পরও এই উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে শিয়াবাদের ভ্রান্তি ও মুশরিক হিন্দুদের হিন্দুয়ানি কালচার ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে। নানা ধরনের শিরক-বিদয়াত এবং কুসংস্কারের রমরমা রাজত্ব চালু হয়। এহেন অবস্থাতেই উপমহাদেশের অযোধ্যার রায়বেরেলিতে ১৭৯৬ সালের ২৯ নভেম্বরে একজন মানুষের জন্ম হয়। নাম ছিল তাঁর সাইয়েদ আহমদ। যাকে আমরা সাইয়েদ আহমদ বেরলভি নামেই চিনি। সাইয়েদ আহমেদ বেরলভির জন্ম যেন মুসলমানদের মুক্তিদূত হিসেবেই হয়েছিল।

সাইয়েদ আহমদ বেরলভি এক সময় ধীরে ধীরে বড় হন। মায়ের কাছ থেকেই জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন উপমহাদেশের আরেকজন নন্দিত নায়ক শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহিমাহুল্লাহর খলিফা ও পুত্র শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভীর কাছে। তিনি ১৮১৭ সালে তাঁর হাতেই বাইয়াতবদ্ধ হন। (চেতনার বালাকোট, পৃষ্ঠা : ১৮)

এরপর এক পর্যায়ে তিনি এই ভারতীয় উপমহাদেশে সম্রাট হুমায়ুনের অসচেতনতায় এবং হিন্দুয়ানি কালচারের প্রভাবে মুসলমানদের ঈমান-আমল, আকিদা ও আখলাকে যে-সকল ভ্রান্তি, কুসংস্কার, শিরক-বিদয়াত অনুপ্রবেশ করেছিল, সেগুলো বিদূরিত করার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া নামক একটি সংগঠন। সেই সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান আমলের সংস্কার, শিখ ও ইংরেজদের জুলুম থেকে মুসলমানদের মুক্তি দানের মহান আকাঙ্ক্ষায় জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত করণের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদের সেই আন্দোলন-সংগঠনে বাংলাদেশেরও অগণিত আলেম-ওলামা অন্তর্ভুক্ত হন এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নোয়াখালীর মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালি অন্যতম (চেতনার বালাকোট, শেখ জেবুল আমীন দুলাল, পৃষ্ঠা: ২৯)। সম্ভবত ইমাম আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস বইতে উল্লেখ করেছেন যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের হাতে ৪০ হাজারের অধিক হিন্দু মুসলমান হয়েছে। ৩০ লাখ মুসলমান তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। সে যাই হোক, সংখ্যাটা কত, সেটা আসলে মতপার্থক্যের বিষয় হলেও তাঁর আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে কোনো মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। হাজি শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ফরায়েজি আন্দোলন এবং মীর নিসার আলী তিতুমীর, সাইয়েদ আহমদ বেরলভি শহীদের আন্দোলনেরই ফসল।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া নামক সংগঠনে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন তরিকার মানুষ তো ছিলেনই, এমনকি শিয়ারাও শিয়াবাদ ছেড়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ তরিকায় চলে আসেন এবং বাইয়াতবদ্ধ হন। শিয়াদের তাজিয়া মিছিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় তাঁর কর্মীদের জেলেও যেতে হয়। এ ছাড়াও সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি রাজ্যে যে তিনি শরিয়াহ কায়েম করেছেন বা ইসলামী হুকুমত করেছেন, সেটাও এই মজবুত এবং বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত প্রদানের জন্য সম্ভবপর হয়েছে। মানে তিনি তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে মর্দান পর্যন্ত এ বিশাল অঞ্চলে শরিয়াহ কায়েম করেন বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করেন। সেটাকে ভিত্তি করে জালিম শিখদের জুলুমের বিরুদ্ধে যে তিনি জিহাদ পরিচালনা করে সাফল্য পেয়েছেন, তা এই বাইয়াতবদ্ধতা ও নির্ভেজাল দ্বীন অনুসরণের ফলেই পেয়েছেন। যদিও সর্বশেষ তিনি বালাকোটের ময়দানে পাঠানদের বিশ্বাসঘাতকতায় শাহাদাত বরণ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য দু'টি বিষয় খেয়াল করুন। প্রথমত, তখন কিন্তু নিভু নিভু পর্যায়ের হলেও মুসলমানদের একটা খিলাফত– উসমানি খিলাফত চলছিল। কিন্তু এই উপমহাদেশে ভয়াবহভাবেই শিরক-বিদয়াত ঘাঁটি করেছিল। পাশাপাশি সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের ওপর মুশরিক শিখদের অনবরত হামলা চলছিল তো চলছিলই। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ দস্যুরা মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ করে যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে ইসলামী তাহজিব তমদ্দুন অনৈসলামিক আবরণে বিনষ্ট হয়ে পড়ছিল। তো তিনি এবং তাঁরা ইসলামী খিলাফতের খলিফার দিকে না তাকিয়ে থেকে নিজের ভূখণ্ডকে, নিজ কওমকে জাগিয়ে তোলা যায়, নিজের জন্মভূমিকে কাফির ও কুফরি শাসনের করায়ত্ত থেকে মুক্ত করা যায়, সেজন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জাগরণী কাজের সূচনা করেন। সেই উপলক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠিত ব্যক্তিদের বাইয়াত প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এরপর তাদের দ্বারা জিহাদ পরিচালনা করেন, এক পর্যায়ে কিছু অঞ্চলে শরিয়াহ কায়েমও করেন। এরপর তো শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে পাড়ি জমান প্রভুর দরবারে।

যাই হোক, এই পয়েন্ট থেকে আমরা শিখতে পারি– বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফাহ কায়েম করতে পারি বা না পারি অন্তত নিজের ভূখণ্ডে হলেও যেন ইসলামী শরিয়াহ কায়েম করতে চেষ্টা করি। আর এজন্যই যেন জামায়াত ও বাইয়াতবদ্ধ জিন্দেগি যাপন করি এবং নিজেদের ঈমান আমল আখলাক আকিদা পরিশুদ্ধ করার কাজ থেকে যেন পিছপা না হই। পাশাপাশি আরেকটা কথাও বলে

রাখি, যা পূর্বেও বলেছিলাম– এই জমিনে বাইয়াত ও সংঘবদ্ধতার কাজ মওদূদী রহিমাহুল্লাহ কিংবা জামায়াত-শিবির চালু করেনি। বরং দ্বীন কায়েমের জন্য এই কাজ দুই-তিন শতাব্দীকাল থেকেই চলে আসছে এবং তাঁরাই করেছেন, যাদের আকিদা ও মানহাজের ব্যাপারে কারো মধ্যেই কোনো সংশয় নেই। তাছাড়া এই কাজ বা এই পন্থায় ও পদ্ধতিতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাজ করেছেন।

বাইয়াত ও শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা

এই পয়েন্টের আলোচনার শুরুতেই একটি হাদিস উপস্থাপন করতে চাই। তা হলো এই– "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে, তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম : ৩৪৪১)

এখানে উক্ত হাদিসের আলোকে যা বুঝতে পারি আমরা, সেটা হলো মুসলিমদের জন্য বাইয়াত নেওয়া আবশ্যক। তবে সে বাইয়াত আমরা কার কাছে নেব? খলিফা বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যিনি, তার কাছেই তো। ঠিক না? কারণ, আনুগত্য তো তারই করতে হবে। তাই না? কিন্তু এখন তো খিলাফত নেই, তাহলে বাইয়াত কার কাছে নেব? আনুগত্যই-বা কার করব? কেউ কেউ বলেন রাষ্ট্র যেহেতু নেই, সেহেতু বাইয়াতও নেই। ইসলামী হুকুমত তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলে বাইয়াতহীন থাকলে গুনাহগার হতে হতো। আচ্ছা, ওনারা কি শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে কখনো কি সাহসে কথাটা বলেন? যেহেতু খলিফা নেই, ইসলামী ইমারাহ নেই, সেহেতু রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যও নেই। বলেন কি? না। বলেন না। এটা বলা তো আরো সহজ ছিল। কারণ এই ব্যাপারে কুরআনের আয়াতও আছে– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, শাসন পরিচালনা করে না, তারা কাফির, জালিম, ফাসিক।' একজন মুসলিমের কি কুফরি বিধান দিয়ে ফায়সালা করা শাসকের আনুগত্য করা উচিত? এ ব্যাপারে তাঁরা কি কোনো বক্তব্য বিবৃতি প্রদান করেন? যদি তা না করে থাকেন, তাহলে ওনারা কেন শুধু বাইয়াতের ব্যাপারেই এভাবে বলেন? কোনো কিন্তু কি এর মধ্যে লুক্কায়িত আছে? মনে হয় থাকতেও পারে। আল্লাহই অধিক অবগত।

যাইহোক, এখন যেহেতু ইসলামী হুকুমত নেই, খিলাফত নেই ইসলামী রাষ্ট্র নেই, শরিয়াহ বাস্তবায়ন নেই, সেহেতু আমরা সেই আমল থেকে বা বাইয়াতহীন থাকার গুনাহ থেকে মুক্ত– তাদের এই বক্তব্যটুকু সঠিক। সঠিক বলতে আংশিক সঠিক। এখন আমার কথা হলো বাইয়াতহীন মৃত্যু যে জাহিলিয়াতের মৃত্যু, এই হাদিসগুলো তো সহিহ। ওপরে বর্ণিত হাদিসটিও তো সহিহ। সবকিছু বাদ। মূল আলোচনায় ফেরত আসি।

খিলাফত না থাকায় খলিফার হাতে বাইয়াত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমাদের দ্বারা। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে মাজুর হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। মুসলমানরা যেন বাইয়াতবদ্ধ জীবন পায়, খলিফার হাতে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইয়াত নিতে পারে, সেজন্য কাজ করার বিধান কী? ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না থাকার জন্যই তো মানুষ জাহিলিয়্যাতের দিকে পঙ্গপালের মতো ছুটছে। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না থাকার জন্যই তো বাইয়াতের মতো আবশ্যিক বিষয় আমাদের কাছ থেকে মিস হয়ে যাচ্ছে। আমরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা থেকে মাহরুম হচ্ছি। এক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো করণীয় নেই? ওপরের হাদিসের মতো করে কুরআনের আরো একটা নির্দেশ হচ্ছে শাসকের আনুগত্য করো। শাসকের আনুগত্য করা ফরজ। হাদিস হলো যে ব্যক্তি মারা যায়, অথচ আনুগত্য বা বাইয়াতের বন্ধনহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। সহিহ মুসলিমের হাদিস যেভাবে, একইভাবে বুখারির হাদিসেও সেভাবে এসেছে।

কুরআনও বলছে আল্লাহ, রাসূল এবং শাসকের আনুগত্য করো (সূরা নিসা : ৫৯)। কোন শাসকের? যে শাসক আমাদেরকে কুরআন-হাদিস অনুযায়ী পরিচালনা করেন। যিনি বা যে শাসক অথবা যেই রাষ্ট্র আমাদেরকে শরিয়াহ অনুযায়ী, কুরআন-হাদিসের বিধান মতো চালান না, তার আনুগত্য করা কি ফরজ? আপনি মুসলিম হিসেবে আপনার বিবেক কী বলে? বরং যিনি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদেরকে চালান না, তার আনুগত্য করা হারাম। স্রষ্টার আনুগত্য ছেড়ে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎ কাজে। নেক কাজে। ভালো কাজে। এগুলোও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (মুসলিম: ১৮৪০, বুখারি: ৭১৪৫) সেই শাসকের বাইয়াতই আমাদেরকে জাহিলিয়াতের মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে, যে শাসক আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী আমাদেরকে পরিচালনা করেন।

আমি হাদিসের মর্ম অনুযায়ী যা বুঝেছি, সেটা হচ্ছে– যতক্ষণ ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী রাষ্ট্র অথবা বৃহৎ পরিসরে ইসলামী খিলাফত কায়েম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে আমরা গুনাহগার হব। কারণ আমরা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করছি না। খিলাফত কায়েম করছি না। তবে হ্যাঁ, তারা গুনাহের অধিকারী হবে না, যারা এই জাহিলি শাসনব্যবস্থা বা খোদাদ্রোহী কাঠামোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা বা অপছন্দ করে গিয়েছে। এই শাসন কাঠামোয় সন্তুষ্ট ছিল না যারা, তারা পাপের ভাগীদার থেকে মুক্তি পাবে। পাশাপাশি আরেকটা কাজও করতে হবে। সেটা হচ্ছে যেই পর্যন্ত না আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা যাচ্ছে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা না যাচ্ছে, আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীনকে কায়েম করা না যাচ্ছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে, তারা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, বা ইকামাতে দ্বীনের শপথ তথা বাইয়াতবদ্ধ হবার কারণে তারা জাহিলিয়াতের মৃত্যু থেকে মুক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এই একই কথাগুলো আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বইয়ের ভূমিকার চার-পাঁচ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

মহান মালিক আমাদেরকে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে, নবুওয়তের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে ময়দানে ইখলাস ও ইয়াকিনের সাথে ভূমিকা পালন করার তাওফিক দান করুন। আ-মি-ন।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও ব্লগার

ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল বিনোদন

মু. আসাদুজ্জামান



ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে সমন্বিত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের জীবনে যে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা ইসলাম স্বীকার করে এবং এর উপযোগী দিকনির্দেশনাও প্রদান করেছে। তবে এই বিনোদন হতে হবে শরিয়তের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। ইসলামে বিনোদন শুধুমাত্র জাগতিক সুখ এবং আনন্দের জন্য নয়, বরং আত্মার প্রশান্তি, নৈতিক উন্নতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসেবেও কাজ করে।

কুরআন ও হালাল বিনোদনের ধারণা

কুরআনে বিনোদনের বিষয়ে সরাসরি আলোচনা না থাকলেও আল্লাহ তায়ালা জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সহজ করে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এমন একটি জীবনের পথে পরিচালিত করা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক এবং মানবসমাজের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। তবে এই ইবাদাত শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজের মতো ধর্মীয় কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের প্রতিটি কার্যক্রম যদি আল্লাহর বিধানের মধ্যে থাকে তাও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং, বিনোদন যদি আল্লাহর আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসারে হয়, তবে তা ইবাদতের অংশ হতে পারে।

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৫)। এই আয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ পাওয়া যায় যে, তিনি মানুষের জীবনকে সহজ ও মসৃণ করতে চান। বিনোদনও জীবনের সহজতার অংশ হতে পারে, যা মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবশ্যই তা ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে।

হাদিসের আলোকে বিনোদন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে বিনোদনের কিছু প্রাকৃতিক উদাহরণ পাওয়া যায়, যা মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। হাদিসে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাস্যোজ্জ্বল আচরণ এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হাদিসে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে আয়েশা (রা) জয়ী হন, পরে রাসূলুল্লাহ (সা) জয়ী হন।" (আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৫৭৮)

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর মধ্যে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার উল্লেখ রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মজাদার বিনোদন ইসলামে সমর্থিত। বিনোদন মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্রিয় রাখে এবং সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। একটি বিখ্যাত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে-কোনো বিনোদনমূলক কাজ বাতিল, তবে তিরন্দাজি, ঘোড়া প্রশিক্ষণ এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খেলাধুলা বৈধ।" (তিরমিজি, হাদিস নং: ১৬৩৭)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, এমন কিছু বিনোদন রয়েছে যা ইসলাম অনুমোদিত মনে করে এবং এগুলো ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে সহায়ক।

হালাল বিনোদনের বিভিন্ন ধরন

ইসলামে হালাল বিনোদনের অনেক ধরন রয়েছে, যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলো ইসলামের নীতিমালা অনুসারে হতে হবে এবং আল্লাহর ইবাদাত ও জীবনের অন্য দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হালাল বিনোদনের ধরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রীড়া ও শারীরিক অনুশীলন : ইসলাম ক্রীড়া এবং শারীরিক অনুশীলনকে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে প্রচলিত ঘোড়দৌড়, তিরন্দাজি, এবং মল্লযুদ্ধের মতো ক্রীড়াগুলো ইসলামে সমর্থিত। এই ধরনের কার্যক্রম শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই সহায়ক। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাঁতার ও তিরন্দাজি শেখাও, কারণ এগুলো মুমিনের জন্য উত্তম খেলা।" (তিরমিজি, হাদিস নং: ১৬৩৮)

এই হাদিসে সাঁতার এবং তিরন্দাজির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা মানুষের শারীরিক এবং আত্মিক উন্নয়নে সহায়ক।

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানো, বিশেষ করে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে হাসি-আনন্দে মেতে ওঠা ইসলামে সমর্থনযোগ্য। এটি শুধু পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে না, বরং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে হাস্যোজ্জ্বল আলোচনা করতেন এবং মজার মজার খেলায় অংশ নিতেন।

প্রকৃতি দর্শন : ইসলামে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা একটি প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন: "নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে মহান নিদর্শন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯০)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত-দিনের পরিবর্তন সবই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। সুতরাং, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর মহান সৃষ্টির প্রশংসা করতে পারি এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। পর্বত, নদী, সাগর, বনভূমি এবং সবুজ বাগান ইত্যাদি দেখে আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শন উপলব্ধি করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা করা বিনোদনের একটি হালাল রূপ হতে পারে।

ইসলামি সাহিত্য ও সঙ্গীত : ইসলামে সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে বিনোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সীমারেখা রয়েছে। ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে সঙ্গীত নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। তবে ইসলামী সাহিত্য এবং সঙ্গীত যদি মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহর স্মরণে সাহায্য করে, তবে তা হালাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ইসলামের প্রথম যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি হাসসান বিন সাবিত (রা) ইসলামের প্রচারে তাঁর কবিতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হাসসান বিন সাবিতকে তাঁর কবিতার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে উৎসাহিত করতেন।

তাছাড়া, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কিছু নারী তাঁর সামনে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তবে এই সঙ্গীতগুলো ছিল প্রশংসামূলক এবং নৈতিকতার চর্চা, তাই সেগুলোকে হারাম বলা হয়নি।

ইসলামে বিনোদনের সীমারেখা

ইসলামে বিনোদনকে হালাল করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। ইসলামিক স্কলাররা বিনোদনের ক্ষেত্রে কয়েকটি সীমারেখা উল্লেখ করেছেন যা মেনে চলা অত্যাবশ্যক। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

ইবাদতের প্রতি বিঘ্ন ঘটাবে না : কোনো বিনোদন এমন হতে পারে না যা ইবাদাত বা আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়। বিনোদন এবং আনন্দ এমন হতে হবে যা নামাজ, রোজা, হজ বা অন্যান্য ইবাদাত বিঘ্নিত না করে।

অনৈতিকতা থেকে মুক্ত : যে-কোনো ধরনের বিনোদনই হতে হবে নৈতিকতার সীমার মধ্যে। অশ্লীলতা, মিথ্যা, গিবত বা অন্য কোনো অনৈতিক কাজ বিনোদনের অংশ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

"তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোনো অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না।" (সূরা আল-আনআম, ৬:১৫১)

সুতরাং, অশ্লীলতা বা অনৈতিক কিছু যা মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘটায় তা বিনোদনের অংশ হতে পারে না।

সমাজে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখবে : বিনোদনের নামে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যা সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বা অশান্তি তৈরি করে। ইসলাম সবসময় শান্তি ও সংহতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। যে-কোনো বিনোদনমূলক কাজ যা মানুষকে বিভক্ত করে বা ফিতনা তৈরি করে তা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

অপচয় না করা : ইসলাম সবসময় মিতব্যয়িতার পরামর্শ দিয়েছে। যে-কোনো বিনোদনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৭)

বিনোদনের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে, যাতে তা ইসলামী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা : হালাল বিনোদন এমন হতে হবে যা শরীর এবং মনের জন্য উপকারী হয়। অতিরিক্ত বিনোদন বা এমন বিনোদন যা শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের শরীর ও মনের যত্ন নেয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমার নিজের ওপর তোমার অধিকার আছে।" (বুখারি, হাদিস নং: ১৮৭৪)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, আমাদের নিজের স্বাস্থ্যের ওপর যত্ন নেওয়া এবং বিনোদনের মাধ্যমে নিজের মনের প্রশান্তি বজায় রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ইসলামী স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী স্কলাররা বিভিন্ন সময়ে বিনোদনের বৈধতা এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, কোনো বিনোদন যদি শরিয়তের নিয়ম অনুসারে হয় এবং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন না করে, তবে তা বৈধ। তবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এমন ধরনের বিনোদন হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইসলামে হালাল বিনোদন নিয়ে বিভিন্ন যুগে ইসলামী স্কলাররা গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করেছেন। তাঁরা বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এর কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। এখানে কিছু বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তির মতামত তুলে ধরা হলো:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম : ইসলামিক স্কলাররা বিনোদনের বৈধতা এবং এর গুরুত্ব নিয়ে নানা সময়ে মতামত প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেছেন, "মানুষের জীবনে বিনোদন অপরিহার্য। মানুষ যদি কোনো ধরনের বিনোদন না পায়, তবে তার মন কষ্ট পায় এবং তার ইবাদাত করার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।" তাঁর এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তবে এটি হতে হবে এমন বিনোদন যা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন না করে এবং মুমিনের জন্য উপকারী হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ) : ইমাম গাজ্জালী (রহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহইয়া উলুম উদ-দীন'-এ বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সীমারেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের জীবনে বিনোদন অপরিহার্য, তবে তা হওয়া উচিত আল্লাহর সীমার মধ্যে। বিনোদন মানুষের মনে নতুন উদ্যম এনে দেয় এবং তাকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করে।" তিনি মনে করেন, বিনোদনের মাধ্যমে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পায় এবং এর ফলে তার ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ইমাম নববী (রহ) : ইমাম নববী (রহ) বিনোদনের ক্ষেত্রে ইসলামী সীমারেখার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "বিনোদন শরীর এবং আত্মার জন্য প্রয়োজনীয়, তবে তা হতে হবে শরিয়তের সীমার মধ্যে। কোনো ধরনের অশ্লীলতা, মিথ্যা বা অন্যায় বিনোদন হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।" ইমাম নববী মনে করেন, বিনোদন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ, যদি তা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয় এবং মানুষের চরিত্রের উন্নতি ঘটায়।

শেখ ইবনে বায (রহ) : শেখ ইবনে বায (রহ) হালাল বিনোদনকে শরিয়তের অংশ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, বিনোদনের উদ্দেশ্য হতে হবে শরীর ও মনের প্রশান্তি এবং আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তিনি বলেন, "বিনোদন এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে তার নৈতিকতায় উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে।" তিনি খেলাধুলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য বিনোদনের ধরনকে হালাল মনে করেন যদি তা শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকে।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : আধুনিক যুগের প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বিনোদনের বৈধতা নিয়ে বেশ কিছু বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে, বিনোদন মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়। তবে তিনি মনে করেন, বিনোদন এমন হতে হবে যা ইবাদাত এবং নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি খেলাধুলা, শিল্প, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে হালাল মনে করেন যদি তা ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থাকে।

ইবনে তাইমিয়া (রহ) : ইবনে তাইমিয়া (রহ) বিনোদনের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "একজন মুমিনের জন্য বিনোদন অবশ্যই হতে হবে নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শরিয়তের সীমার মধ্যে। আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোনো ধরনের বিনোদন গ্রহণযোগ্য নয়।" তাঁর মতে, বিনোদন এমন হওয়া উচিত যা আত্মার প্রশান্তি ও শারীরিক সুস্থতার সহায়ক হয় এবং মানুষকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করে।

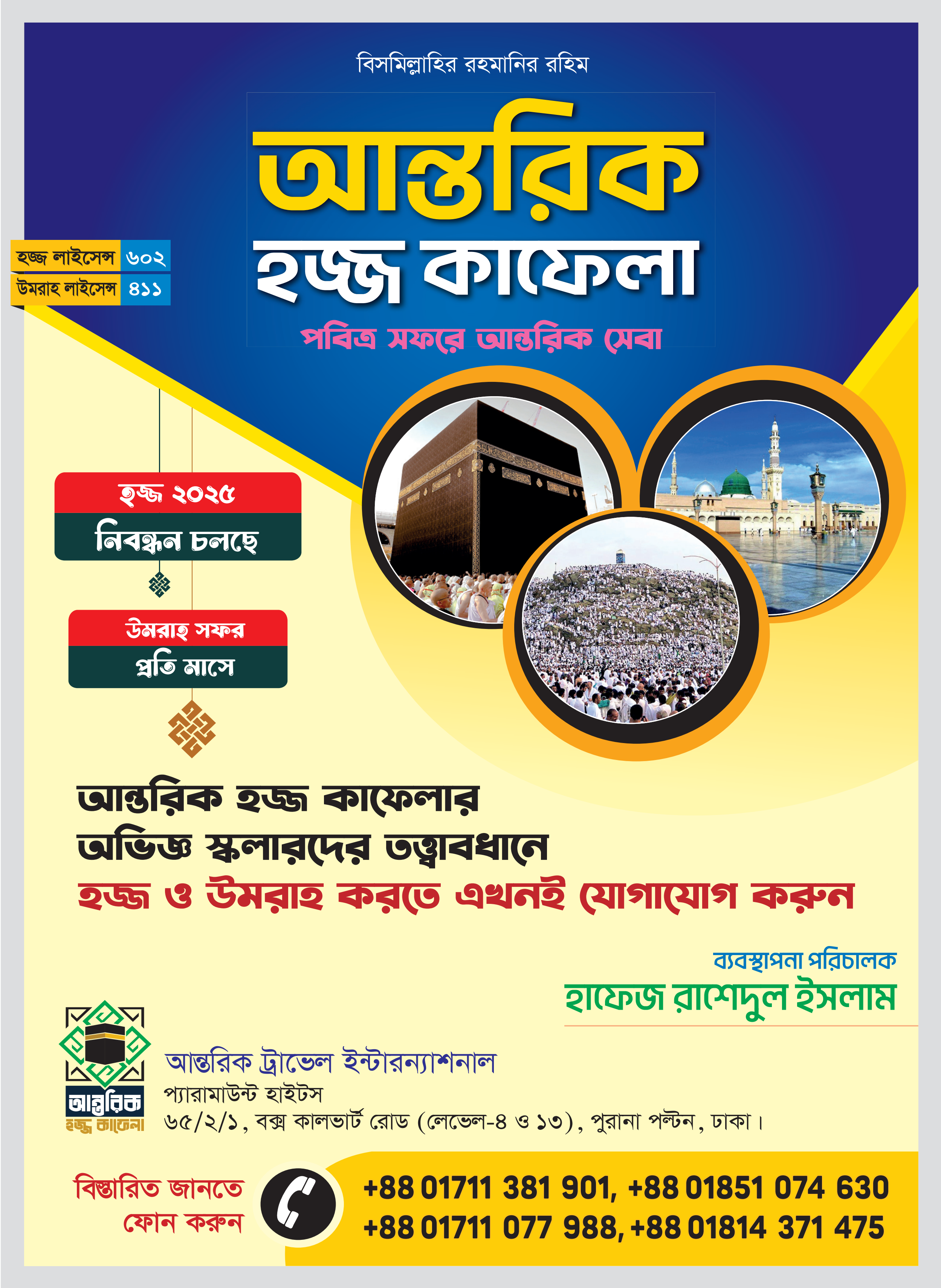
মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উথাইমিন (রহ) : শেখ আল-উথাইমিন (রহ) মনে করেন, ইসলামে বিনোদন বৈধ, তবে তা হতে হবে পাপমুক্ত এবং শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী। তিনি বলেন, "ইসলাম মানুষকে কঠোরতার দিকে আহ্বান করে না, বরং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের কথা বলে। তাই হালাল বিনোদন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদি তা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।"

বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মতামত থেকে বোঝা যায়, হালাল বিনোদন ইসলামে অনুমোদিত এবং তা মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এই বিনোদন অবশ্যই আল্লাহর বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। ইসলামী স্কলাররা জোর দিয়েছেন যে, বিনোদন এমন হওয়া উচিত যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় হিসেবে কাজ করে।

ইসলামে বিনোদনকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করা হয়েছে, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসারে হতে হবে। হালাল বিনোদন শুধুমাত্র দেহ ও মনের আরাম নয়, বরং তা ইবাদতের প্রস্তুতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করার একটি মাধ্যম হতে পারে। ইসলামে বিনোদনের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা মেনে চললে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। বিনোদন এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে ইবাদতের পথে আগ্রহী করে এবং তাদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক হয়।

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত এমন বিনোদন বেছে নেওয়া যা আমাদের জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনে, সেই সঙ্গে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হয়। হালাল বিনোদন শুধুমাত্র জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে না, বরং এটি আল্লাহর সৃষ্টিকে প্রশংসা করার একটি সুযোগও দেয়।

লেখক : কেন্দ্রীয় স্পোর্টস সম্পাদক


বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
আন্তরিক
হজ্জ কাফেলা
পবিত্র সফরে আন্তরিক সেবা
হজ্জ লাইসেন্স ৬০২
উমরাহ লাইসেন্স ৪১১
হজ্জ ২০২৫
নিবন্ধন চলছে
উমরাহ্ সফর
প্রতি মাসে
আন্তরিক হজ্জ কাফেলার
অভিজ্ঞ স্কলারদের তত্ত্বাবধানে
হজ্জ ও উমরাহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
হাফেজ রাশেদুল ইসলাম
আন্তরিক হজ্জ কাফেলা
আন্তরিক ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল
প্যারামাউন্ট হাইটস
৬৫/২/১, বক্স কালভার্ট রোড (লেভেল-৪ ও ১৩), পুরানা পল্টন, ঢাকা।
বিস্তারিত জানতে
ফোন করুন
+88 01711 381 901, +88 01851 074 630
+88 01711 077 988, +88 01814 371 475



বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন
সুযোগ ও প্রস্তুতি

মু. সাইফুল ইসলাম

[শেষ পর্ব]

বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এই ধারাবাহিকটিতে আমরা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিশ্বের নানান দেশের উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ ও নিজস্ব অর্থায়নে পড়তে যাওয়ার খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করেছি। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়েও আমরা গাইডলাইন দিয়েছি। এটি এই সিরিজের শেষ পর্ব, এই পর্বে আমরা নতুন কোনো স্কলারশিপ সম্পর্কে আলোচনা করব না। সর্বশেষ পর্বটিতে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কেমন প্রোফাইল থাকলে স্কলারশিপ পাওয়া যায়? অনার্স বা মাস্টার্সে রেজাল্ট কম থাকল করণীয় কী? বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পিএইচডি করতে যাওয়া ভালো হবে নাকি দ্বিতীয় মাস্টার্স করতে যাওয়া ভালো হবে? নিজের প্রোফাইলকে কীভাবে নিজেই মূল্যায়ন করতে হয়? স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে কী কী বিষয়ে যত্নবান হলে স্কলারশিপ পাওয়া সহজতর হয়? আজকের লেখায় আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজব।

কেমন প্রোফাইল থাকলে স্কলারশিপ পাওয়া যায়?

উচ্চশিক্ষায় যেতে ইচ্ছুক যে-কোনো শিক্ষার্থীর প্রধান প্রশ্ন থাকে, আমার প্রোফাইলটি কেমন হলে আমি স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারি। আমাদের এককথায় উত্তর থাকে ভারসাম্যপূর্ণ প্রোফাইল (Balanced Profile)। একটু ব্যাখ্যা করে বলি, যে-কোনো স্কলারশিপে শিক্ষার্থী বাছাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কিছু ক্রাইটেরিয়া ও মার্কিং সিস্টেম তৈরি করে রাখে। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাবলিকলি প্রকাশিত থাকে না। তবে কিছু কিছু স্কলারশিপের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটেই বিস্তারিত দেওয়া থাকে। প্রতিটি ক্রাইটেরিয়া পূর্ণ করলেই কেবল স্কলারশিপ পাওয়া যায়। আরো সহজ করে বলি, মনে করুন যে-কোনো একটি স্কলারশিপের পূর্ণমান ১০০ নম্বর। ৩০ নম্বর পূর্ববর্তী সকল পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য, ১৫ নম্বর সিভি বা জীবন বৃত্তান্তের জন্য, ১০ নম্বর মোটিভেশন লেটার বা স্টেটমেন্ট অব পারপাসের জন্য, ১০ নম্বর রেফারেন্স লেটারের জন্য, ২০ নম্বর ভাষা দক্ষতার জন্য, ১০ নম্বর সহায়ক কার্যক্রমের (Extra-curricular Activities) জন্য, ৫ নম্বর পাবলিকেশন বা অন্যান্য স্কিলের জন্য (এভাবে শুধুমাত্র বুঝানোর জন্য দেয়া হয়েছে, এককে স্কলারশিপের ক্ষেত্রে এককে ক্রাইটেরিয়া থাকে এবং মার্কিংও ভিন্ন থাকে)।

এখন একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ক্রাইটেরিয়াতে মার্কস পাওয়ার পাশাপাশি সর্বোচ্চ একটি মার্কস পেতে হবে। তাহলে স্কলারশিপ পাওয়া যাবে। সুতরাং, বুঝা গেল স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র রেজাল্ট বা কোনো একটি বিষয়ে ভালো হলেই হবে না। সবগুলো বিষয়ে মোটামুটি ভালো হলে অর্থাৎ প্রোফাইলটি ভারসাম্য হলেই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কোনো একটি বা একাধিকটিতে যদি খারাপ হয় তাহলে তা কীভাবে পূরণ করা যাবে? এককথায় যে ক্ষেত্রটিতে আরো ভালো করার সুযোগ আছে, সেটিতে তখন জোর দিতে।

কম রেজাল্ট দিয়ে কীভাবে স্কলারশিপ পাওয়া যাবে?

ভারসাম্যপূর্ণ প্রোফাইলের কথা শুনে অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, কারণ তাদের পড়াশোনা শেষের দিকে। এখন শত চেষ্টা করলেও ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব না। তাহলে তুলনামূলক কিছুটা কম রেজাল্ট দিয়ে কী স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে কিছু কাজ করতে হবে। আমরা সেগুলোই নিম্নে আলোকপাত করব।

আবেদনের সংখ্যা বাড়ান, অফার লেটারের চেয়ে রিজেক্ট লেটার বেশি আসবে, এটা মাথায় রেখে আবেদন করুন। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো। আপনি যত বেশি আবেদন করবেন, তত বেশি চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। রেজাল্ট কম ভেবে আবেদন না করে বসে থাকা যাবে না।

যারা সিজিপিএকে প্রধান ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ধরে না, সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুঁজে বের করুন। বিশ্বের কিছু কিছু সরকারি বৃত্তি আছে, যাদের প্রধান ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের রেজাল্ট। আপনি সেগুলোকে বাদ দিন। যেগুলো রিসার্চ বেইজড এবং রেজাল্টকে প্রাধান্য দেয় না সেগুলোর তালিকা করুন এবং সঠিকভাবে আবেদন করুন।

মোটিভেশনাল লেটার/স্টেটমেন্ট অব পারপাস খুব ভালো করে লিখুন। যে-কোনো স্কলারশিপ পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মোটিভেশন লেটার, তাই এর মাধ্যমে স্কলারশিপ কর্তৃপক্ষকে

কনভিন্স করুন। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলুন।

আইইএলটিএস স্কোর ভালো করুন, আমেরিকার জন্য হলে জিআর স্কোর ভালো করুন। আপনার রেজাল্ট কম, তাহলে আপনি মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন দিয়ে আবেদন করার চিন্তা বাদ দিয়ে IELTS এর প্রস্তুতি নিয়ে সর্বোচ্চ স্কোর করুন। আপনার স্কলারশিপ পাওয়া কোনো কিছুই আটকাতে পারবে না।

সহায়ক কার্যক্রম বা এক্সট্রা কারিকুলার ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বৃদ্ধি করুন। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, সামার ক্যাম্প, উইন্টার ক্যাম্প, কোর্স ও কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করুন। ইউকে, তুরস্ক, ইউরোপ ও আমেরিকায় দক্ষ সংগঠক, নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আর্টিকেল পাবলিকেশন করুন। আপনি যদি দ্বিতীয় মাস্টার্স বা পিএইচডিতে আবেদন করতে চান, আপনার জন্য প্রধান কাজই হচ্ছে গবেষণা প্রবন্ধ পাবলিশ করা। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নাল থেকে আপনার ১/২টি গবেষণাপত্র আপনার অন্যান্য সকল ঘাটতিকে ছাপিয়ে যেতে যথেষ্ট। এককথায়, অন্যান্য ক্রাইটেরিয়াতে আপনার দুর্বলতা থাকলে গবেষণায় মনোযোগী হোন।

এরপর আমরা প্রায়ই এমন একটি প্রশ্ন পাই যে, আমি তো দেশে ইতোমধ্যে মাস্টার্স শেষ করে ফেলেছি, আমি কী পিএইচডি ফান্ডিংয়ের জন্য আবেদন করব নাকি আরেকটি মাস্টার্স করার জন্য আবেদন করব? এ ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করুন, আমাদের দেশে মাস্টার্সগুলো সাধারণত এক বছরের হয়ে থাকে। তাই বিদেশে এই মাস্টার্সকে রিসার্চ মাস্টার্স হিসেবে গণ্য করতে বেগ পেতে হয়, রিসার্চ করার অভিজ্ঞতা থাকা ছাড়া পিএইচডি অফার করে না। কোনো শিক্ষার্থীর যদি এক বছরের মাস্টার্সের পাশাপাশি ভালো মানের কিছু আর্টিকেল পাবলিশ থাকে, ভালো আইইএলটিএস স্কোর থাকে এবং চমৎকার একটি রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করে সাবমিট করতে পারে, তাহলে সে অনায়সে পিএইচডি স্কলারশিপ বা ফান্ডিং পাওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারে। যে সকল দেশে IELTS স্কোরের প্রয়োজন হয় না, সেগুলোতে রিসার্চ পেপার ও ভালো একটি রিসার্চ প্রপোজাল দিয়েই ফান্ডিং পাওয়া সম্ভব। এখন কোনো শিক্ষার্থীর যদি ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো যথেষ্ট পরিমাণ না থাকে, তাহলে আমরা তাদেরকে দ্বিতীয় মাস্টার্স করার জন্য বলি। দেশের বাহিরে একটি রিসার্চ মাস্টার্স করে খুব সহজেই পরবর্তীতে পিএইচডি স্কলারশিপে চান্স পেতে পারে।

সর্বশেষ স্নাতক অধ্যয়নরতদের কিছু মৌলিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমরা এই সিরিজের ইতি টানব। সাত পর্বের এই সিরিজের প্রথম পর্বে আমরা প্রস্তুতির করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, শেষ পর্বে কিছু বিষয় আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। সাধারণত আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন হওয়ার পরই নানান কিছু করার চিন্তা মাথায় আসে। বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করতে গিয়ে যখন দেখে অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে, অনেক কিছু শেখা হয়নি, অনেক স্কিলের অভাব, তখন মনে হয়, ইশ! যদি আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে রাখতে পারতাম! বাস্তবে, প্রস্তুতি ছাড়া সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা ঠিক নয়। উচ্চশিক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কয়েকটি বিষয় শুরু থেকেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন না কেন, ইংরেজিতে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া এবং নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারা এখনকার সময়ে অপরিহার্য। পত্রিকা পড়া ও নিজে নিজে অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার ইংরেজি দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করুন। কোনো ইভেন্টের আয়োজক হিসেবে কাজ করলে মানুষকে সামলানো, বাজেট প্রস্তুতি এবং সংগঠনের দক্ষতা গড়ে ওঠে, যা নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে ভূমিকা রাখবে, আমরা পূর্বেই বলেছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই গুণকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

এছাড়া, যে বিষয়ে পড়াশোনা করছেন, সে বিষয়ের বাইরেও কিছু জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে চলমান বিশ্ব নিয়ে জানা-শোনা থাকা অপরিহার্য। গুগলে সার্চ দিয়ে আর্টিকেল পড়া, রিসার্চ পেপার এবং ব্লগ পড়ে নিজের আগ্রহের জায়গা নিয়ে জ্ঞান বাড়াতে পারেন। নেটওয়ার্কিং আজকের যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য নেটওয়ার্কিংয়ের বিকল্প নেই। আপনার ডিপার্টমেন্টের বা বিষয়ের সিনিয়রদের মধ্যে যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষায় গিয়েছে, তাদের সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক তৈরি করুন। যে-কোনো ওয়ার্কশপ বা সেমিনারে গিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করুন, আপনার শিক্ষকদের মধ্য থেকে গবেষণা জানে এমন একজনকে সুপারভাইজার হিসেবে মনোনীত করুন। শিক্ষক কিংবা সিনিয়রদের থেকে রিসার্চ ইন্টারেস্ট মিলিয়ে একজনকে মেন্টর হিসেবে গ্রহণ করুন।

বর্তমান যুগে যে-কোনো কাজ করার জন্য MS Word, PowerPoint এবং Excel শেখা এখন অপরিহার্য। এগুলো শেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সফটওয়ার ব্যবহার শিখুন, বিশেষ করে চ্যাটজিপিটি ও এআই সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন। গুগল স্কলার ও রিসার্চগেইটে আইডি তৈরি করুন। এছাড়াও আপনার সাবজেক্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন রিসার্চ সফটওয়ার ব্যবহার করা শিখুন। রিপোর্ট তৈরি, প্রেজেন্টেশন দেওয়া এবং ডাটা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্কিলগুলো শিখে রাখলে আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে সহায়তা করবে। নিজের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মঞ্চে উঠুন, মানুষের সামনে কথা বলা শিখুন। বিতর্ক, পাবলিক স্পিকিং, কম্পিটিশন ইত্যাদি বিষয়ে নিজেকে যুক্ত করুন। একইসাথে, পড়াশোনার বাইরে প্রচুর বই, ম্যাগাজিন ও পত্রিকা পড়ুন, যা আপনাকে নতুন চিন্তার জগতে নিয়ে যাবে এবং নিজেকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।

সর্বোপরি, প্রস্তুতির সবটুকু আপনাকেই নিতে হবে, তাই বসে না থেকে আজ থেকেই শুরু করুন আপনার উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি। মনে রাখবেন, স্কলারশিপ আপনাকে কেউ পাইয়ে দিতে পারবে না, আপনাকেই পেতে হবে এবং তা একদিনে হঠাৎ করে পেয়ে যাবেন না। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি, সঠিক তথ্যের অবাধ সরবরাহ। ছাত্র সংবাদে প্রকাশিত এই সিরিজের মাধ্যমে আমরা আপনাকে প্রস্তুতির উপাদান ও স্কলারশিপের সঠিক তথ্যাবলি দিয়েছি। বাকি কাজটুকু আপনার, সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবেন একদিন, তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এখানেই শেষ করছি, আবারও নতুন কোনো পরিসরে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ হবে, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।

লেখক : পিএইচডি গবেষক, আঙ্কারা ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কেন্দ্রীয় সভাপতি বরাবর প্রশ্ন

প্রশ্ন-১ : শিক্ষা ক্ষেত্রে আস্থার প্রতিষ্ঠান রেটিনা, ফোকাস আর ব্যাংকিংয়ে আস্থা ইসলামী ব্যাংক, চিকিৎসায় ইবনে সিনা ইত্যাদি ।বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকার অনেক বেশি । পার্টটাইম জবেরও অনেক চাহিদা রয়েছে । বাইরের দেশে রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান সম্ভাবনাময় খাত । এইসব ক্ষেত্রে ছাত্রশিবিরের ভবিষ্যতে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরির কোনো চিন্তাভাবনা আছে কিনা?

ইকরাম আহমেদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ

উত্তর : ছাত্রশিবির হলো ছাত্রসংগঠন,ছাত্রদের কল্যাণ নিয়েই যার কাজ । অর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কোনো চিন্তা ছাত্রশিবিরের নেই । তবে ছাত্রশিবির একটিপ্রোডাক্টিভ জাতি গঠনের প্রত্যাশায় সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে । ছাত্রশিবির সর্বদা সকল জনশক্তিকে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রিক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে । ছাত্রশিবির তার জনশক্তিদের বিদেশে প্রোডাক্টিভ জনশক্তি হিসেবে প্রেরণের জন্য প্রোগ্রাম ও সেমিনার থেকে শুরু করে আগ্রহী জনশক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে । বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষে যাতে তারা দক্ষতার সাথে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সেজন্য ছাত্রশিবির বিদেশি কমিউনিটির মাধ্যমেও তদারকি করে থাকে ।

প্রশ্ন-২: দ্বীন কায়েম করার জন্য কি সংগঠন প্রয়োজন? ছাত্রশিবির কীভাবে দ্বীন কায়েম করবে?

সাদমানুল হক রাজনান, ৯নং দক্ষিণ আকবর শাহ, চট্টগ্রাম

উত্তর : সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ । এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন । ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ । সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয় । সংগঠন সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ, "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ ইসলামকে) আঁকড়ে ধরো ।" (আলে-ইমরান: ১০৩) "যেই ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু ।" (সহীহ মুসলিম) সংগঠন সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-এর উক্তি,"সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই ।" ছাত্রশিবির আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথেই দ্বীন কায়েম করতে চায় ।

প্রশ্ন-৩ : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দাবি করে যে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে না । কিন্তু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পোগ্রামে শিবিরের নেতাকর্মীদের দেখা যায় । এমনকি শিবির নেতারা তাদের জনশক্তিদের জামায়াতের মিছিল সমাবেশে নিয়ে যায় । তাহলে কি শিবিরকে জামায়াতের ছাত্রসংগঠন বলা যায় না?

মো: সাইফুল্লাহ, সদর, কিশোরগঞ্জ

উত্তর : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আদর্শিক কিছু মিল থাকলেও রাজনৈতিকভাবে এটার কোনো সম্পর্ক নেই । ছাত্রশিবির শুধুমাত্র ছাত্রসংগঠন, কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংঠন নয় । দুটি সংগঠনেরই আলাদা ও স্বতন্ত্র সংবিধান রয়েছে । ছাত্রশিবিরের কর্মপদ্ধতি ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ নিজস্ব সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হয় । ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরাসরি সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় । ছাত্রশিবিরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার শুধু ছাত্রশিবিরের নিজের হাতেই সীমাবদ্ধ । তবে আদর্শগত মিল থাকার কারণে কিছু প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকলেও সেটা রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠন হিসেবে নয় ।

আহ্বান

প্রিয় পাঠক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ । ছাত্রসমাজের মুখপত্র, আপনার প্রিয় ম্যাগাজিন **ছাত্র সংবাদ** পাঠকদের জন্য নিয়ে এলো নিয়মিত পর্ব **'কেন্দ্রীয় সভাপতি বরাবর প্রশ্ন'** । বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রসমস্যা, শিক্ষাঙ্গন ও সংগঠন নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন । কেন্দ্রীয় সভাপতির কাছে আপনার প্রশ্নটি নাম ও ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন আজই । প্রশ্ন পাঠানোর ই-মেইল : chhatra_sangbad@yahoo.com

একনজরে শিক্ষা ও ক্যাম্পাস সংবাদ

ছাত্র সংবাদ ডেস্ক

২০ অক্টোবর - ০০ নভেম্বর ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মশাল মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ সময় তারা ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগও দাবি করেছেন। (যুগান্তর, ২২ অক্টোবর ২০২৪)
- চলমান সঙ্কট-সীমাবদ্ধতা নিরসন এবং জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটের আলোকে ফ্যাসিবাদমুক্ত ক্যাম্পাস বিনির্মাণের লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনা জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। (সংগ্রাম, ২২ অক্টোবর ২০২৪)
- স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ৭ ছাত্রকে ব্রাশফায়ারে হত্যার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম হত্যার রাজনীতি শুরু করে ছাত্রলীগ। এরপর আর থেমে থাকেনি ছাত্রলীগের হত্যাকাণ্ড, বিভিন্ন সময়ে একের পর এক হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। (সংগ্রাম, ২৫ অক্টোবর ২০২৪)
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনি কোটা, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য পোষ্য কোটা ও খেলোয়াড় কোটা বাতিলের লিগ্যাল [আইনি] নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সোলায়মান তুষার ৬ নভেম্বর ২০২৪ রোজ মঙ্গলবার ইমেইলে এ নোটিশ পাঠান। (সংগ্রাম, ৭ নভেম্বর-২০২৪)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিএইচডি ডিগ্রি পাস না করেই জালিয়াতি করে অধ্যাপক হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত কর্মহীন অবস্থায় বিনা ছুটিতে তিনি প্রায় ১১ মাস বিদেশে অবস্থান করেন, ওই সময়টাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত দেখিয়ে বেতনভাতাদি নিয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। (যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০২৪)
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল ইসলামের মেয়ে নূর নুসরাতের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে শিক্ষক হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল হুদা হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে রিট দায়ের করেছেন। হাইকোর্ট তিনিসহ তিনজনের নিয়োগ অবৈধ বলে রুল জারি করেছেন। (নয়া দিগন্ত, ৫ নভেম্বর-২০২৪)
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের [স্নাতক সম্মান] প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১২, ১৯ ও ২৬ এপ্রিল এবারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল মঙ্গলবার ভর্তি পরীক্ষার উপকমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর-২০২৪)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে এসে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েছেন শাখা ছাত্রলীগ সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আলীম। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র নজরুল কলা ভবনে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে এলে এ ঘটনা ঘটে। (নয়া দিগন্ত, ২০ অক্টোবর ২০২৪)
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাফিজুল ইসলামকে বিভাগীয় সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, নম্বর কমিয়ে দেওয়া, ছাত্রীদের পোশাক বিষয়ে বাজে মন্তব্য, সমকামিতা ও মানসিক অত্যাচারসহ নানা অভিযোগ তুলে তার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। (যুগান্তর ২৪ অক্টোবর ২০২৪)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

- ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে পদত্যাগী সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন নামে নতুন প্ল্যাটফরম গঠন করা হয়েছে। (ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর ২০২৪)
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সব দলের অংশগ্রহণে সুস্থধারার রাজনৈতিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত এবং জাকুস সচলসহ ক্যাম্পাসে

অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এতে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর জাবিতে প্রকাশ্যে এলো বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। (যায়যায়দিন, ৩১ অক্টোবর ২০২৪)

- 'জাহাঙ্গীরনগর সংস্কার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিন্তের দাবি জানিয়েছে। একই সাথে তাদের পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচন কমিশন গঠন করে জাকসু কার্যকর করার দাবিও জানানো হয়। সংগঠনটির মুখপাত্র নাজিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক যৌথ বিবৃতিতে আহবায়ক ইয়াহিয়া জিসান এবং সদস্য সচিব আবু বকর আলী এ দাবি জানান। (নয়া দিগন্ত, ২ নভেম্বর-২০২৪)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ ও দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। (নয়া দিগন্ত, ২২ অক্টোবর ২০২৪)
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্ট দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবলীগ নেতা হানিফের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের বেশির ভাগই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য। (নয়া দিগন্ত, ২৬ অক্টোবর ২০২৪)

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

- আধিপত্য বিস্তার, ক্যাম্পাসে বিরেইজম দেখানো, ভিন্নমত দমনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা নির্যাতনসহ নানা অভিযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৭৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। এদের বেশির ভাগই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। তাদের মধ্যে ৭ জনকে দুই বছর ৫৪ জনকে এক বছর এবং ১৪ জনকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক রয়েছেন। এছাড়া ১১ শিক্ষার্থীকে মুচলেকা নেওয়ার মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। (যুগান্তর, ২৯ অক্টোবর ২০২৪)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের মিটিংয়ে না যাওয়ায় এক আবাসিক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৭তম আবর্তনের মোহাম্মদ কাউসার। ভুক্তভোগী জানান, একই আবর্তনে অধ্যয়নরত ছাত্রদল কর্মী তৌহিদুল ইসলাম তাকে ১০০৪ নম্বর রুমে মারধর করেছেন। এই ঘটনার বিচার চেয়ে হল প্রভোস্টের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন কাউসার। (যুগান্তর, ২৭ অক্টোবর ২০২৪)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তরসহ তিন দফা দাবিতে পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার অবরোধ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচির ডাক দেন। শিক্ষার্থীদের দাবি তিনটি হলো স্বৈরাচারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে আইনের আওতায় আনা, সাত দিনের মধ্যে প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে সেনাবাহিনীর দক্ষ অফিসার নিয়োগ ও ক্যাম্পাসের বাকি ১১ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (কালের কণ্ঠ, ৫ নভেম্বর-২০২৪)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)ঃ

- ছাত্রলীগের হাতে দুই বছর আগে নির্মমভাবে খুন হওয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ফারদিন নুর পরশ হত্যা মামলার বিচার আজও হয়নি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ফারদিন হত্যা মামলা তদন্তে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। (কালের কণ্ঠ, ৩ নভেম্বর-২০২৪)

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

- রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগে বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবু সালেহ মোহাম্মাদ ওয়াদুদুর রহমান ওরফে ডক্টর তুহিন ওয়াদুদ, মোহাম্মদ ইউসুফ এবং আইরিন বেগমের বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান কমিটি করা হয়েছে। জানা যায়, তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের গেজেট অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। (সংগ্রাম, ৯ নভেম্বর-২০২৪)

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। সম্প্রতি এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মতো মাদকসেবীদের হাতেনাতে ধরেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জানা গেছে, কিছু শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তার সাথে সুসম্পর্কের খাতিরে ক্যাম্পাসে অবাধ চলাফেরা ও যাতায়াতের সুযোগ পায় বহিরাগত মাদকসেবী চক্র। এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতারা মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাম্পাসকে মাদকের অভয়ারণ্য করে তুলছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। (নয়া দিগন্ত, ৩ নভেম্বর-২০২৪)

রাজশাহী মেডিকেল কলেজঃ

- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে কথিত শান্তি সমাবেশের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৫ ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ছয় শিক্ষার্থী। (যুগান্তর, ৭ নভেম্বর-২০২৪)

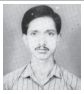
সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

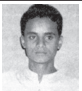
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এইচ এনায়েত হোসেন তিন মাস পর বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে ফিরলে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তোপের মুখে পড়েন। কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে সেনাসদস্যরা এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। (ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর-২০২৪)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হল ডাইনিং, ক্যান্টিন, পত্রিকার হকার এবং আশপাশের বিভিন্ন দোকান, হোটেলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বাকি প্রায় আট লাখ টাকা। গত কয়েক বছরের বিভিন্ন সময়ে এসব দোকান এবং হলের ডাইনিং, ক্যান্টিন থেকে বাকি খেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। (যুগান্তর, ১১ নভেম্বর-২০২৪)

ডিসেম্বর মাসের শহীদ যারা

	নাম	শাহাদাতের তারিখ	শাহাদাতের স্থান	মান	ছবি
৪	শহীদ আব্দুল জব্বার	২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২	আহত রাবি বিএনসিসি ভবনে, শহীদ নিজ বাড়িতে, রাজশাহী	কর্মী	
১১	শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ	১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫	হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম	সাথী	
২৬	শহীদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৮	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	কর্মী	
৩৭	শহীদ মুহাম্মদ আব্দুল খালেক	৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৯	ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হল প্রাঙ্গণ	কর্মী	
৬২	শহীদ শামসুজ্জামান খান রেজা	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	সদস্য	
৬৩	শহীদ কামরুজ্জামান আলম	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	কর্মী	
৬৪	শহীদ শেখ মোজাম্মেল হক (মঞ্জু)	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	কর্মী	
৭৮	শহীদ মুহাম্মদ ফজলে এলাহী	৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল	কর্মী	
৭৯	শহীদ আব্দুল করিম	৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	সিলেটের কানাইঘাট শাহজালাল ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বের ওভারব্রিজের উপর	সদস্য	
৮০	শহীদ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে এক বাড়িতে, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৮১	শহীদ শওকত হোসেন তালুকদার	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে এক বাড়িতে, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৮২	শহীদ মঞ্জুরুল কবির	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হলের সামনে, ময়মনসিংহ	সাথী	
৯৩	শহীদ হাফেজ আবু নাছের	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	কক্সবাজার কৃষি অফিস সড়কে	সদস্য	
১০৬	শহীদ রহিম উদ্দিন	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে	সদস্য	
১০৭	শহীদ মাহমুদুল হাসান	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে	সাথী	
১০৮	শহীদ আবদুল মুনিম বেলাল	২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	সিলেট জিন্দাবাজার থেকে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে	সাথীপ্রার্থী	

১২০	শহীদ মুহাম্মদ আলমাছ মিয়া	৯ ডিসেম্বর, ২০০৩	মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ মসজিদ (বেলা ১.৩০ মিনিট)	সদস্যপ্রার্থী	
১২৪	শহীদ শোয়েব আহমদ দুলাল	১২ ডিসেম্বর, ২০০৫	সিলেট এমসি কলেজ মাঠ	সাথী	
১৪১	শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম	৩ ডিসেম্বর ২০১২	দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার রানীরবন্দর বাজারে	সাথী	
১৮৪	শহীদ হোসেন আলী	৩ ডিসেম্বর, ২০১৩	খান বাহাদুর আহছানুল্লাহ কলেজ মোড়, সাতক্ষীরা	কর্মী	
১৮৫	শহীদ মোঃ আরিজুল ইসলাম	৩ ডিসেম্বর, ২০১৩	গড়ানবাড়িয়া মোড়, সাতক্ষীরা	কর্মী	
১৮৬	শহীদ মনোয়ার জাওয়াত সিয়াম	৩ ডিসেম্বর, ২০১৩	চাঁদপুর সদর হাসপাতাল	কর্মী	
১৮৭	শহীদ হাফেজ আব্দুল্লাহ আল সালমান	১০ ডিসেম্বর, ২০১৩	ফেনী শহরের খাজুরিয়া রাস্তার মাথা	সাথী	
১৮৮	শহীদ আনোয়ার হোসেন	১২ ডিসেম্বর, ২০১৩	সোনাইমুড়ি হাসপাতালে নেয়ার পথে বিপুলাসার নামক স্থানে, ফেনী	সাথীপ্রার্থী	
১৮৯	শহীদ হাফেজ যোবায়ের হোসেন	১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩	সোনাপুর বাজার, ফেনী	সাথী	
১৯০	শহীদ আব্দুস সাত্তার	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চত্বর, নোয়াখালী	কর্মী	
১৯১	শহীদ সাইফুল ইসলাম	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চত্বর, নোয়াখালী	সাথী	
১৯২	শহীদ মতিউর রহমান সজিব	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চত্বর, নোয়াখালী	কর্মী	
১৯৩	শহীদ আব্দুল আজিজ রায়হান	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চত্বর, নোয়াখালী	সাথী	
১৯৪	শহীদ মনিরুল ইসলাম	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩	পাটগ্রাম উপজেলার জোংড়া ইউনিয়নের অ-বাজারের সাথে রেল লাইনের পার্শ্বে, লালমনিরহাট	সাথী	
১৯৫	শহীদ সাজু হাসান	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩	রংপুর মেডিকেল কলেজ গেট	সাথী	
১৯৬	শহীদ শামীম হোসেন	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩	জয়পুরহাট সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের হালট্রি মোড়	কর্মী	
১৯৭	শহীদ ইনসান আলী	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩	জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে নেওয়ার পথে	সাথী	
১৯৮	শহীদ মনসুর আহমেদ	২৯ ডিসেম্বর, ২০১৩	মালিবাগ শহীদি মসজিদের সামনে, ঢাকা	সাথী	

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মডেল টেস্ট

পূর্ণমান : ৫০

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাইয়েরা! আশা করি ভালো আছেন। গত আগস্ট ২০২৩ সংখ্যা থেকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়মিত মডেল টেস্টের আয়োজন করে আসছি। উক্ত মডেল টেস্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে পুরস্কৃত করা হবে।

মডেল টেস্টে অংশগ্রহণের নিয়মাবলি :

- উত্তরপত্রের বৃত্ত ভরাট করে সে অংশটা ছাত্র সংবাদ-এর ই-মেইলে (chhatra_sangbad@yahoo.com) পাঠাতে হবে।
- উত্তরপত্র পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪।
- প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান।
- প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫ নাম্বার কর্তন করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ নাম্বারপ্রাপ্ত ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে।
- মডেল টেস্টটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

1. Find out correct synonym of 'hazard'.
   a) impartial b) static
   c) immobile d) danger
2. Nasim will duscuss the issue with Rafiq ____ phone.
   a) in b) over c) by d) on
3. Every mother loves her child.(Negative)
   a) There is no mother but loves her child.
   b) Every mother cannot but loves her child.
   c) There is not mother loving her child.
   d) No mother loves her child.
4. Select the correct preposition to complete the sentence: I went____ great sufferings.
   a) on b) for c) through d) with
5. We eat____we may live.
   a) for b) because c) so that d) lest
6. The verb of the word fool is-
   a) fool b) befool c) foolish d) foul
7. 'A rolling stone gathers on moss. 'Here 'rolling' is-
   a) verb b) an adjective
   c) a participle d) a gerund
8. It is many years since, ____.
   a) 1 meet you b) I help you
   c) I met you d) I have met you
9. What you (do) at this moment? The correct form of verb is-
   a) do you do b) doing
   c) are you doing d) have done
10. 'সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে'– the correct translation of this sentence is-
    a) It is raining since moming.
    b) It has been being raining since morning.
    c) It has been drizzling since moring.
    d) It has been raining for moming.
11. A reward has been announced for the employees who... hard.
    a) have worked b) has worked
    c) will be work d) have had worked
12. What cannot be cured must be endured. (Active).
    a) We must be endured what we can not cure.
    b) We cannot cure what we must endure.
    c) Must be endure can cure.
    d) We must endure what we cannot cure.
13. If I had seen him____.
    a) I would tell him the matter
    b) I might tell him the matter
    c) I will have told him the matter
    d) I might have told him the matter
14. Everybody knows this. (Interrogative)
    a) Does anybody knows this?
    b) Who does not know this?
    c) Who do not know this?
    d) Do anybody know this?
15. Which of the following has incorrect tag?
    a) I am your friend, amn't I?
    b) He used to play football, didn't he?
    c) Man cannot swim, can he?
    d) Have a cup of tea, won't you?

১৬. 'কোর্মা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) আরবি (খ) পর্তুগিজ (গ) তুর্কি (ঘ) হিন্দি

১৭. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?
(ক) গামছা (খ) মশারি (গ) লুঙ্গি (ঘ) চাদর

১৮. কোনটি ইংরেজি শব্দ?
(ক) ম্যাজেন্টা (খ) পিস্তল (গ) আলমারি (ঘ) কমা

১৯. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ?
(ক) জাত (খ) গৈরিক (গ) উদ্ধত (ঘ) গাম্ভীর্য

২০. Epic শব্দের পরিভাষা কী?
(ক) কিংবদন্তি (খ) পুরাণ
(গ) মহাকাব্য (ঘ) বিস্মৃত কাহিনি

২১. ‘কান্নায় শোক কমে’- এখানে ‘কান্নায়’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?
(ক) করণ কারকে ৭মী (খ) অপাদানে ৭মী
(গ) অধিকরণে ৭মী (ঘ) সম্প্রদানে ৭মী

২২. নিচের কোনটি এক বচনের উদাহরণ?
(ক) মানুষ মরণশীল (খ) লোকে বলে
(গ) ডাক্তার রোগী দেখছে (ঘ) বনে বাঘ বাস করে

২৩. কোন বিরাম চিহ্নে বিরাম নিতে হয় না?
(ক) হাইফেন (খ) ড্যাশ (গ) সেমিকোলন (ঘ) কোলন

২৪. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) জবাবদিহি (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) একত্রিত (ঘ) গৌরবিত

২৫. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?
(ক) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়ল
(খ) দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল
(গ) দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
(ঘ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

২৬. ‘ভাটিয়ালি’ গান বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের গান?
(ক) ঢাকা ও সিলেট (খ) ময়মনসিংহ ও সিলেট
(গ) ময়মনসিংহ ও রংপুর (ঘ) রংপুর ও দিনাজপুর

২৭. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
(ক) ময়নামতি (খ) সোনারগাঁও
(গ) ঢাকা (ঘ) পাহাড়পুর

২৮. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
(ক) সংবাদ (খ) আজকের কাগজ
(গ) ঢাকা প্রকাশ (ঘ) ইত্তেফাক

২৯. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কে?
ক) ড. মোবাশ্বের মোনেম খ) ড. শেখ আব্দুর রশিদ
গ) মো. সুজায়েত উল্লাহ ঘ) ড. নুরুল কাদির

৩০. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
(ক) ইসরাইল (খ) দক্ষিণ আফ্রিকা
(গ) তাইওয়ান (ঘ) হাইতি

৩১. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?
(ক) ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ (খ) ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
(গ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৩২. চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান কে?
ক) সাইমন জনসন খ) হান কাং
গ) নিহোন হিদানকিও ঘ) জন হোপফিল্ড

৩৩. জাতিসংঘের কততম অধিবেশনে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) ২৭তম (খ) ২৮তম (গ) ২৯তম (ঘ) ৩০তম

৩৪. জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
ক) ফুমিও কিশিদা খ) হান নাতিশ
গ) শিগেরু ইশিবা ঘ) তারো আসো

৩৫. ‘রাষ্ট্রপতি পুরস্কার’ প্রদান করা হয়–
(ক) শিল্প উন্নয়নের জন্য (খ) শ্রেষ্ঠ শিল্প উদ্যোক্তার জন্য
(গ) কৃষি উন্নয়নের জন্য (ঘ) শিক্ষায় অবদানের জন্য

৩৬. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চালু হয় কবে?
ক) ২০১০ খ) ২০০৯ গ) ২০০৮ ঘ) ২০০৭

৩৭. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?
(ক) আমানত গ্রহণ
(খ) ঋণ মঞ্জুর
(গ) অর্থ ও মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ
(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সংস্থান

৩৮. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে সর্ববৃহৎ সাহায্যদানকারী দেশ কোনটি?
(ক) জাপান (খ) ইউএসএ (গ) ইউকে (ঘ) কুইট

৩৯. বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের সমিতির নাম-
ক) সফটএস খ) বেসিস
গ) বাটেক্সপো ঘ) বিএসসিআইস

৪০. চলতি বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান কে?
ক) সাইমন জনসন খ) হান কাং
গ) নিহোন হিদানকিও ঘ) জন হোপফিল্ড

৪১. বীজ : চারাগাছ :: ডিম : ?
ক) অমলেট খ) মুরগিছানা গ) মুরগি ঘ) কুসুম

৪২. শব্দ : কর্ণ :: আলো : ?
ক) শোনা খ) চক্ষু গ) বুদ্ধি ঘ) অন্ধকার

৪৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?
a) মুহুর্মুহু b) মূহুর্মুহু c) মুর্হুমূর্হু d) মুর্হুর্মুহু

৪৪. পাঁচজন ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D বসে আছে C এর বাঁ পাশে, B বসে আছে E এর ডানদিকে, A বসে আছে C এর ডান দিকে এবং B বসে আছে D এর বাঁদিকে। যদি E যে কোন দিকে সবার শেষে অবস্থান করে তাহলে মাঝখানে কে থাকবে?
ক) A খ) B গ) C ঘ) D

৪৫. নিচের কোনটি ভিন্ন?
ক) ব অ এ ত খ) ন ব পো ত
গ) তো ধি ক ত ঘ) লি প ঞ্জ ত

৪৬. শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?

U	N	F	P	?

ক) R খ) T গ) C ঘ) A

৪৭. ‘প্রসূন’- এর প্রতিশব্দ হলো-
ক) ভ্রমর খ) ফল গ) পুষ্প ঘ) বৃষ্টি

৪৮. যদি ENTRY দিয়ে 12345 এবং STEADY দিয়ে 931785 বোঝায় তবে TENANT দিয়ে নিচের কোনটি বোঝায়?
a) 956169 b) 196247 c) 352123 d) 312723

৪৯. A, B-এর তুলনায় খাটো কিন্তু C-এর চেয়ে লম্বা। D, A এর তুলনায় খাটো কিন্তু C-এর চেয়ে লম্বা। E, B-এর তুলনায় খাটো কিন্তু A-এর চেয়ে লম্বা। উচ্চতার দিক থেকে মাঝারি কে?
ক) A খ) B গ) C ঘ) D

৫০. যদি GAMES-এর বানান HBNFT হয়, তবে SPORTS-এর বানান একটি শব্দ হবে?
ক) RONQSR খ) TQPSUT
গ) ROQSR ঘ) RQNOSR

অক্টোবর ২০২৪ পুরস্কার বিজয়ী

প্রথম স্থান : মোরছালিন হোসাইন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ।

দ্বিতীয় স্থান : আসিফ আহমদ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ।

তৃতীয় স্থান : আবদুর রশীদ, সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রাম ।

এখানে কাটুন ••

উত্তরপত্র : ডিসেম্বর ২০২৪

নাম : .... পিতা : ....

ঠিকানা : গ্রাম : .... পোস্ট কোড : .... থানা : .... জেলা : ....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .... শ্রেণী :................ বর্ষ/বিভাগ :................ রোল :..........

ফোন/মোবাইল : .... ইমেইল : ....

বৃত্ত ভরাট পদ্ধতি

ভুল পদ্ধতি

সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন নং	উত্তর				প্রশ্ন নং	উত্তর				প্রশ্ন নং	উত্তর			
১	ক	খ	গ	ঘ	১৮	ক	খ	গ	ঘ	৩৫	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ	১৯	ক	খ	গ	ঘ	৩৬	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ	২০	ক	খ	গ	ঘ	৩৭	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ	২১	ক	খ	গ	ঘ	৩৮	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ	২২	ক	খ	গ	ঘ	৩৯	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ	২৩	ক	খ	গ	ঘ	৪০	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ	২৪	ক	খ	গ	ঘ	৪১	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ	২৫	ক	খ	গ	ঘ	৪২	ক	খ	গ	ঘ
৯	ক	খ	গ	ঘ	২৬	ক	খ	গ	ঘ	৪৩	ক	খ	গ	ঘ
১০	ক	খ	গ	ঘ	২৭	ক	খ	গ	ঘ	৪৪	ক	খ	গ	ঘ
১১	ক	খ	গ	ঘ	২৮	ক	খ	গ	ঘ	৪৫	ক	খ	গ	ঘ
১২	ক	খ	গ	ঘ	২৯	ক	খ	গ	ঘ	৪৬	ক	খ	গ	ঘ
১৩	ক	খ	গ	ঘ	৩০	ক	খ	গ	ঘ	৪৭	ক	খ	গ	ঘ
১৪	ক	খ	গ	ঘ	৩১	ক	খ	গ	ঘ	৪৮	ক	খ	গ	ঘ
১৫	ক	খ	গ	ঘ	৩২	ক	খ	গ	ঘ	৪৯	ক	খ	গ	ঘ
১৬	ক	খ	গ	ঘ	৩৩	ক	খ	গ	ঘ	৫০	ক	খ	গ	ঘ
১৭	ক	খ	গ	ঘ	৩৪	ক	খ	গ	ঘ					